এসলামের প্রকৃত সালাহ

তওহীদ প্রকাশন

এ যামানার এমাম, এমামুয্‌যামান *(The Leader of the Time)*

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

এসলামের প্রকৃত সালাহ্

এ যামানার এমাম, এমামুয্‌যামান *(The Leader of the Time)*

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়

তওহীদ প্রকাশন

৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন: ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০-১৭৪৬৫১

www.hezbuttawheed.com

www.tawheedprocation.org

প্রচ্ছদ । এস এম শামসুল হুদা

সার্বিক ব্যবস্থাপনা, অলঙ্করণ ও মুদ্রণ । মো: রিয়াদুল হাসান

প্রথম প্রকাশ । জানুয়ারী ২০০৫

চতুর্থ প্রকাশ । সংশোধিত

সেপ্টেম্বর ২০০৮

পঞ্চম প্রকাশ । পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত

মার্চ ২০১১

ISBN- 978-984-33-1561-1

সূচীপত্র

১. এই ‘কেন’র জবাব দেবার আমি চেষ্টা কোরছি

২. তাহোলে সালাতের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব কি?

৩. সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ হোল- সালাহ

৪. সালাতের আত্মিক ভাগ

৫. ছবি

৬. মেয়েদের সালাহ

৭. সালাতের এই প্রাণহীন দুরবস্থা কেন হোল, কেমন কোরে হোল?

৮. সালাহ এসলামের কঙ্কাল

৯. সালাতুল খওফ

১০. জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস

যামানার এমামের লিখিত অন্যান্য বই এবং **আমাদের অন্যান্য প্রকাশনা**

- এ ইসলাম ইসলামই নয়
- এসলামের প্রকৃত রূপরেখা
- এসলামের প্রকৃত সালাহ্
- দাজ্জাল? ইহুদী-খ্রীস্টান ‘সভ্যতা’!
- Dajjal? the Judio-Christian ‘Civilization’! (অনুবাদ)
- হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস
- দাজ্জাল? ইহুদী-খ্রীস্টান ‘সভ্যতা’! (ডকুমেন্টারী ফিল্ম)
- দাজ্জাল প্রতিরোধকারীদের সম্মান ও পুরস্কার (ডকুমেন্টারী ফিল্ম)
- অন্যান্য দল না কোরে হেযবুত তওহীদ কেন কোরব? (আলোচনার ভিসিডি)
- বাঘ-বন-বন্দুক (শিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ)

আউযুবেল্লাহে মেনাশ শায়তানের রাজিম
বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম

আল্লাহর দেয়া মানুষের জন্য জীবন বিধানে সালাতের গুরুত্ব ও মূল্য অত্যন্ত অধিক। তাঁর কোর'আনে আল্লাহ আশি বারেরও বেশী সালাহ্-কে উল্লেখ কোরেছেন, সালাহ্ কায়েম কোরতে বোলেছেন। আজ পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ, লক্ষ লক্ষ বিরাট বিরাট সুদৃশ্য মসজিদে দিনে পাঁচবার একত্রিত হয় সালাহ্ কায়েম কোরতে, আল্লাহর আদেশ পালন কোরতে। কিন্তু আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মো'মেনদের সালাহ্ কায়েম কোরতে আদেশ কোরেছেন সে উদ্দেশ্য সাধিত হোচ্ছে না। একশ' পঞ্চাশ কোটির এই জাতিটি, যে জাতিটি নিজেদের মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী বোলে বিশ্বাস করে, এই জাতিটি আজ পৃথিবীর অন্য সব জাতি দ্বারা পরাজিত, লান্ছিত, অপমানিত, নিগৃহীত। আল্লাহর রসুল পৃথিবী থেকে চলে যাবার সময় তাঁর গড়া এ জাতিটি সংখ্যায় ছিলো পাঁচ লাখের মত। এটা ইতিহাস যে আল্লাহর রসুল চলে যাবার পর ৬০/৭০ বছরের মধ্যে ঐ ছোট্ট জাতিটি, একটি একটি কোরে নয়, এক সঙ্গে তদানিন্তন পৃথিবীর দু'টি বিশ্বশক্তিকে আক্রমণ কোরে তাদের সামরিকভাবে পরাজিত কোরে অর্দ্ধেক পৃথিবীতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা কোরেছিলো। সেই পাঁচ লাখের জাতিটাও সালাহ্ কায়েম করতো, আজ একশ' পঞ্চাশ কোটির এই জাতিটাও সালাহ্ কায়েম করে, অন্তত করে বোলে বিশ্বাস করে। তাহোলে সেই একই কাজ কোরে, আল্লাহর একই আদেশ পালন কোরে সেই পাঁচ লাখের প্রায় নিরক্ষর, চরম দরিদ্র জাতি বিশ্বজয় করলো আর বর্ত্তমানের একশ' পঞ্চাশ কোটির জাতি, তাদের মধ্যে বহু উচ্চ শিক্ষিত, আলেম, পীর মোরশেদ থাকা সত্ত্বেও, বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদের একটা বিরাট অংশের মালিক হওয়া সত্ত্বেও আজ বিশ্বের সমস্ত জাতি দ্বারা পরাজিত, নিগৃহীত। **একই কাজ কোরে আল্লাহর একই আদেশ পালন কোরে পরিণতি, ফল শুধু আকাশ পাতাল নয়, একেবারে উল্টো কেন?**

এই ‘কেন’র জবাব দেবার আমি চেষ্টা কোরছি-

তার আগে নামায শব্দটা ব্যবহার না কোরে সালাহ্ শব্দ কেন ব্যবহার কোরছি তা বোলে নেয়া দরকার। এ উপমহাদেশে সালাতের বদলে নামায শব্দটা ব্যবহারে আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে সালাহ্ বোললে অনেকে বুঝিই না সালাহ্ কি। কোর’আনে কোথাও নামায শব্দটা নেই কারণ কোরান আরবী ভাষায় আর নামায পার্শি অর্থাৎ ইরানী ভাষা। শুধু ঐ নামায নয় আরও অনেক শব্দ আমরা ব্যবহার কোরি যা কোরানে নেই। যেমন খোদা, রোযা, বেহেশত, দোযখ, ফেরেশতা, জায়নামায, মুসলমান, পয়গম্বর ইত্যাদি। এই ব্যবহার মোসলেম দুনিয়ায় শুধু ইরানে এবং আমাদের এই উপমহাদেশে ছাড়া আর কোথাও নেই। এর কারণ আছে। কারণটা হোল- ইরান দেশটি সমস্তটাই অগ্নি-উপাসক ছিলো। আল্লাহর নবীর সুন্নাহ পালনের জন্য উম্মতে মোহাম্মদী যখন ইরানকে তিন শর্ত্তের একটি মেনে নেয়ার আমন্ত্রণ দিলো তখন ইরান পৃথিবীর দুই বিশ্বশক্তির একটি; অন্যটি খ্রীস্টান রোমান। ঐ তিন শর্ত্ত হোল-

১) আল্লাহর রসুল সত্য দীন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন- এই দীন মেনে নিয়ে মোসলেম হোয়ে যাও, তাহোলে তোমরা আমাদের ভাই হোয়ে যাবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুল এই দীনকে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার যে দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পণ কোরেছেন, সে দায়িত্ব তোমাদের ওপরও বর্ত্তাবে। ২) যদি তা গ্রহণ না করো তবে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করো, আমরা আল্লাহর দেয়া দীন, কোর’আনের আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু কোরবো; তোমরা যার যার ধর্মে থাকবে, আমরা বাধাতো দেবই না বরং সর্বপ্রকারে তোমাদের এবং তোমাদের ধর্মকে নিরাপত্তা দেব; বিনিময়ে তোমাদের যুদ্ধক্ষম লোকেরা বার্ষিক সামান্য একটা কর দেবে, যার নাম জিজিয়া। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, স্ত্রীলোক, রোগগ্রস্ত মানুষ এবং বালক-বালিকা, শিশুগণকে এ কর দিতে হবে না। এর পরও তোমাদের রক্ষার জন্য যুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে যেসব যুদ্ধক্ষম লোক আমাদের পক্ষ হোয়ে যুদ্ধ কোরবে তাদের ঐ জিজিয়া দিতে হবে না। ৩) যদি এই দুই শর্ত্তের কোনটাই না মেনে নাও তবে যুদ্ধ ছাড়া আর পথ নেই। আমরা তোমাদের আক্রমণ কোরে পরাজিত কোরে আল্লাহর দীন, জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কোরবো।

এটা ইতিহাস যে প্রচণ্ড শক্তিশালী, অন্যতম বিশ্বশক্তি ইরান অবজ্ঞাভরে ঐ প্রথম দুই শর্ত্ত উপেক্ষা কোরে তৃতীয় শর্ত্ত যুদ্ধকেই বেছে নিয়েছিলো ও অল্প সময়ের মধ্যে ঐ ছোট্ট উম্মতে মোহাম্মদীর কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হোয়ে গিয়েছিলো। পরাজিত হবার পর প্রায় সমস্ত ইরানী জাতিটি অল্প সময়ের মধ্যে পাইকারী ভাবে দীন এসলাম গ্রহণ কোরে মোসলেম হোয়ে গিয়েছিলো। এই ঢালাও ভাবে মোসলেম হোয়ে যাবার ফলে তারা এসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা পূর্ণভাবে বুঝতে সমর্থ হোল না অর্থাৎ তাদের আকীদা সঠিক হোল না। তারা এসলামে প্রবেশ করলো কিন্তু তাদের অগ্নি-উপাসনার অর্থাৎ আগুন পূজার সময়ের বেশ কিছু বিষয় সঙ্গে নিয়ে এসলামে প্রবেশ কোরলো। আগুন উপাসনাকে তারা নামায পড়া বলতো, সালাহ্-কে তারা নামায বোলতে শুরু কোরলো, তাদের অগ্নি-

উপাসনার ধর্মে উপবাস ছিলো, তারা সাওমকে রোযা অর্থাৎ উপবাস বোলতে লাগলো, মোসলেমকে তারা পার্শি ভাষায় মুসলমান, নবী-রসুলদের পয়গম্বর, জান্নাহ-কে বেহেশত, জাহান্নামকে দোযখ, মালায়েকদের ফেরেশতা এমন কি মহান আল্লাহর নাম পর্যন্ত পরিবর্ত্তন করে খোদা ইত্যাদিতে ভাষান্তর কোরে ফেললো। শুধু যে সব ব্যাপার আগুন পূজার ধর্মে ছিলো না, সেগুলি স্বভাবতই আরবী শব্দেই রোয়ে গেল; যেমন যাকাহ, হজ্ব ইত্যাদি। তারপর মোসলেম জাতি যখন ভারতে প্রবেশ কোরে এখানে রাজত্ব কোরতে শুরু কোরলো তখন যেহেতু তাদের ভাষা পার্শি ছিলো সেহেতু এই উপমহাদেশে ঐ পার্শি শব্দগুলির প্রচলন হোয়ে গেলো। এক কথায় বলা যায় যে, **আরবের এসলাম পারস্য দেশের ভেতর দিয়ে ভারতে, এই উপমহাদেশে আসার পথে পার্শি ধর্ম, কৃষ্টি ও ভাষার রং-এ রং বদলিয়ে রঙ্গীন হোয়ে এলো।**

ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম:- অগ্নি-উপাসক ইরান না হোয়ে যদি মুর্ত্তিপূজক হিন্দু ভারত উম্মতে মোহাম্মদীর কাছে সামরিকভাবে পরাজিত হোয়ে এসলাম ভালো কোরে না বুঝেই ব্যাপকভাবে, ঢালাওভাবে এই দীনে প্রবেশ কোরতো তবে তারা সালাহ্-কে পূজা বা উপাসনা, সাওমকে উপবাস, নবী-রসুলকে অবতার, জান্নাহ-কে স্বর্গ, জাহান্নামকে নরক, মালায়েকদের দেবদূত, দেবতা, আল্লাহকে ভগবান বা ঈশ্বর ইত্যাদি চালু কোরে ফেলতো এবং আমরা যেমন এখন নামায, রোযা, বেহেশত, দোযখ, পয়গম্বর, ফেরেশতা, খোদা শব্দগুলি ব্যবহার কোরি তেমন কোরে ঐ ভারতীয় শব্দগুলি ব্যবহার কোরতে অভ্যস্ত হোয়ে যেতাম।

আমরা হেয্বুত তওহীদ এই পার্শি শব্দগুলির ব্যবহার ত্যাগ কোরে আল্লাহ কোর'আনে যে শব্দগুলি ব্যবহার কোরেছেন সেই শব্দগুলি আবার চালু করার চেষ্টা কোরছি। মহান আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে সতর্ক করে বোলে দিয়েছেন যে, আল্লাহর আছে সুন্দর সুন্দর নাম, তোমরা তাঁকে সে নামেই ডাক, যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কোরবে (সুরা আরাফ- ১৮০) তাই খোদা শব্দের বদলে আল্লাহ, নামাযের বদলে সালাহ্ এবং রোযার বদলে সাওম শব্দের আমাদের এই ব্যবহার।

মহান আল্লাহ এই মহাসৃষ্টির বিশাল থেকে ক্ষুদ্রতম যা কিছু সৃষ্টি কোরেছেন তাঁর প্রত্যেকটারই কোন না কোন উদ্দেশ্য আছে; উদ্দেশ্যহীন একটি অণু বা পরমাণুও তিনি সৃষ্টি করেন নাই। তেমনি, তিনি মানব জাতিকে যা কিছু আদেশ-নিষেধ কোরেছেন তারও প্রত্যেকটিরই কোন না কোন উদ্দেশ্য আছে, উদ্দেশ্যহীন একটি ক্ষুদ্রতম আদেশও দেন নাই, কারণ তিনি সোবহান; নিখুঁত, ত্রুটিহীন। যিনি ক্ষুদ্রতম আদেশও উদ্দেশ্যহীন ভাবে দেবেন না তিনি যে সালাতের আদেশ আশীবারেরও বেশী দিয়েছেন তা কি উদ্দেশ্যহীন হোতে পারে? অবশ্যই নয়। এবং শুধু যে উদ্দেশ্যহীন নয় তা-ই নয়; যেহেতু তিনি এ আদেশ এতবার দিয়েছেন সেহেতু এ আদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাহোলে সালাতের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব কী?

এসলামে সালাতের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব এত বড় যে, তা বোঝাবার জন্য আমাকে আল্লাহর খলিফা অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির অধ্যায় থেকে শুরু কোরতে হবে- যদিও খুব সংক্ষেপে।

এই মহাবিশ্ব, অগণিত ছায়াপথ, নীহারিকা, সূর্য, চন্দ্র, তারা ও এগুলো সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করার জন্য অসংখ্য মালায়েক সৃষ্টি করার পর আল্লাহর ইচ্ছা হোল এমন একটি সৃষ্টি করার যার মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি থাকবে। তাই তিনি নিজ হাতে সৃষ্টি কোরলেন আদম (আ:) আর হাওয়াকে। আদমের (আ:) মধ্যে আল্লাহ তাঁর নিজ রূহ্ থেকে ফুঁকে দিলেন (কোর'আন- সুরা হেজর ২৯) তাঁর নিজের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসহ সব গুণাবলি। নাম দিলেন আল্লাহর প্রতিনিধি- খলিফাতুল্লাহ। তারপর আদম ও হাওয়ার (আ:) দেহের ভেতরে প্রবেশ কোরে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনায় প্রভাব ফেলার শক্তি দিলেন এবলিসকে আদম-হাওয়াকে পরীক্ষার জন্য (কোর'আন- সুরা নেসা ১১৯)। আদমের (আ:) কারণে আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে বিতাড়িত হোয়ে এবলিস আল্লাহকে বোলল যে তোমার এই খলিফাকে দিয়ে আমি তোমাকে অস্বীকার করাবো। জবাবে আল্লাহ বোললেন- আমি যুগে যুগে নবী-রসুল পাঠিয়ে বনী আদমকে হেদায়াহ সঠিক দিক নির্দেশনা অর্থাৎ সেরাতুল মোস্তাকীম দান কোরব। যারা এই সেরাতুল মোস্তাকীমের ওপর দৃঢ় থাকবে তুমি তাদের বিপথে চালনা কোরতে পারবে না, তারা হেদায়াতে থাকবে, তাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কোরে আমি তাদের জান্নাতে দেব। জবাবে এবলিস বোলল- তুমি তোমার খলিফাকে যে সেরাতুল মোস্তাকীম দেবে তার সম্মুখে, পেছনে, ডানে, বামে আমি ওঁৎ পেতে বোসে থাকবো (আর তাদের সে পথ থেকে ছিনিয়ে নেবো); আর দেখবে যে তাদের অধিকাংশ অকৃতজ্ঞ (অর্থাৎ অধিকাংশই আমি ছিনিয়ে নেব)। এর উত্তরে আল্লাহ বোললেন তোমাকে এবং যাদের তুমি সেরাতুল মোস্তাকীম থেকে ছিনিয়ে নেবে তাদের দিয়ে আমি জাহান্নাম ভর্ত্তি কোরবো (সুরা আ'রাফ- ১৭, ১৮)। এখানে বলা প্রয়োজন এই সেরাতুল মুস্তাকীম কী? দেখা যাচ্ছে আল্লাহর সাথে এবলিসের চ্যালেঞ্জটা সালাহ্ (নামাজ), সওম (রোযা), হজ্ব, যাকাত বা চুরি ডাকাতি, ব্যাভিচার, খুন নিয়ে নয়, চ্যালেঞ্জটা এই সেরাতুল মোস্তাকীমটাকেই নিয়ে।

এই সেরাতুল মোস্তাকীম হোল-একমাত্র আল্লাহর খেলাফত করা, তাঁর প্রতিনিধিত্ব করা। এই প্রতিনিধিত্ব কোরতে হোলে প্রথমেই মানুষকে বিশ্বাস কোরতে হবে এবং সাক্ষ্য দিতে হবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন এলাহ (হুকুমদাতা) নেই অর্থাৎ লা এলাহা এল্লা আল্লাহ। প্রত্যেক নবী রসুলই তার সমপ্রদায়কে আল্লাহর এই তওহীদ মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ যে লা-এলাহা এল্লাল্লাহর কথা বোলেছেন তা বর্ত্তমানে পৃথিবীতে প্রচলিত লা-এলাহা এল্লা আল্লাহ নয়। বর্ত্তমানে মোসলেম জগতের সকলেই লা এলাহা এল্লা আল্লাহ-এ বিশ্বাস করে, কিন্তু তারা সেরাতুল মুসতাকীমে, সহজ-সরল পথে নেই। কারণ প্রকৃত তওহীদ অর্থাৎ লা-এলাহা এল্লা আল্লাহ হোচ্ছে আল্লাহকে ছাড়া আর সমস্ত রকম ক্ষমতাকে অস্বীকার করা; এবং এই অস্বীকার জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্ব অঙ্গনে। এক

কথায় যে কোন বিষয়ে, যে কোন প্রশ্নে, যেখানে আল্লাহ বা তাঁর রসুলের কোন বক্তব্য আছে সেখানে আর কারো কথা, আদেশ, নিষেধ, নির্দেশ অগ্রাহ্য করা (সুরা আহযাব- ৩৬); হোক সেটা ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সমাজ-ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য। এখানে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সঙ্গে রসুলকেও অঙ্গীভূত কোরছি এই কারণে যে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ হাতে-কলমে কার্যকরী কোরে দেখানোর দায়িত্ব তাঁর রসুলের এবং তিনি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, নির্দেশের বাইরে কিছুই করেন না, কিছুই বলেন না (কোর'আন সুরা নজম- ৩-৪)। এই হোল এসলামের - সেরাতুল মোস্তাকীম। বর্ত্তমানে অন্য জাতিগুলির তো কথাই নেই- মোসলেম হবার দাবীদার এই একশ' পঞ্চাশ কোটির জাতির মধ্যেও কোথাও নেই এবং তাদের মধ্যে এ বোধ ও উপলব্ধিও নেই যে তওহীদ না থাকার অর্থই হোচ্ছে শেরক ও কুফর এবং তওহীদহীন কোন এবাদত আল্লাহ কবুল করেন না। যে বিষয়ে আল্লাহ বা তাঁর রসুলের কোন নির্দেশ আছে সেটা যত ছোট, যত সামান্যই হোক সে বিষয়ে অন্য কারো নির্দেশ, ব্যবস্থা গ্রহণ মানেই শেরক, অংশীবাদ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও স্বীকার করা।

শুরু হোল বিশাল খেলা, বিরাট পরীক্ষা। আল্লাহ তাঁর কথামত যুগে যুগে প্রতি জনপদে পাঠাতে লাগলেন তাঁর নবী-রসুলদের তওহীদ ও সেরাতুল মোস্তাকীম দিয়ে।

আল্লাহ নবী-রসুলদের মাধ্যমে বনি-আদম, মানুষকে আরও জানিয়ে দিলেন যে, যে বা যারা ঐ তওহীদ (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব) এবং সেরাতুল মোস্তাকীমের ওপর অটল থাকবে জীবনের কোন অঙ্গনে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মানবে না, স্বীকার কোরবে না তাদের তিনি সমস্ত অপরাধ, পাপ, গোনাহ মাফ কোরে জান্নাতে স্থান দেবেন চিরকালের জন্য (কোর'আন- সুরা যুমার- ৫৩)। আর যে বা যারা জীবনের যে কোন অঙ্গনে, যে কোন বিষয়ে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অস্বীকার কোরে অন্য কোন শক্তি বা নিজেদের তৈরী আদেশ-নিষেধকে মেনে নেবে তারা জীবনে যত পুণ্য, যত সওয়াবই কোরুক, যত ভালো কাজই কোরুক আল্লাহ তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ কোরবেন চিরকালের জন্য (সুরা মায়েদা- ৭২, সুরা নেসা- ৪৮, বোখারী, মোসলেম, তিরমিযি)।

আল্লাহর নবী-রসুলরা যুগে যুগে প্রতি জনপদে ঐ তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নিয়ে আসতে লাগলেন আর ঐ তওহীদের ওপর ভিত্তি কোরে দীন প্রতিষ্ঠা কোরতে লাগলেন। আদমের (আ:) মাধ্যমে আল্লাহ বনি-আদমকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান কোরেছেন- যার ইচ্ছা সে আল্লাহর তওহীদ, সার্বভৌমত্ব স্বীকার ও গ্রহণ কোরতে পারে, যার ইচ্ছা তওহীদ অস্বীকার কোরে অন্যের প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব স্বীকার কোরতে পারে (কোর'আন- সুরা কাহাফ- ২৯)। যুগে যুগে আল্লাহ যাদের হেদায়াহ অর্থাৎ সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তারা তওহীদে বিশ্বাসী হোয়ে নবী রসুলকে মেনে নিয়েছে। নবী-রসুলরা তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তির ওপর দীনের এমারত, অট্টালিকা তৈরী কোরেছেন। যারা তওহীদে, সেরাতুল মোস্তাকীমে বিশ্বাস কোরেছে তারা ঐ এমারত, অট্টালিকায় বসবাস কোরতে শুরু কোরেছে।

যথাসময়ে নবী-রসুলরা পৃথিবী থেকে চোলে যাবার পর এবলিসের প্ররোচনায় মানুষ তওহীদ ভিত্তিক ঐ এমারত ভাংতে শুরু কোরেছে এবং ধীরে ধীরে ওর কাঠামো এবং শেষে ভিত্তি তওহীদ সুদ্ধ ভেংগে ফেলেছে। এরপর রহমানুর রহিম আবার নবী-রসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা এসে মানুষকে বোলেছেন- তোমরা তো আল্লাহর দেয়া দীনটাকে নষ্ট কোরে ফেলেছো, এমারত ভেংগে ফেলেছো এবং শেরক ও কুফরীতে ফিরে গেছো। শুধু তাই নয় এর ভিত্তি, তওহীদটাকেও তো টুকরো টুকরো কোরে ফেলেছো এবং শেরক ও কুফরীতে ফিরে গেছো। আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর তওহীদ, তাঁর সার্বভৌমত্ব, সেরাতুল মুস্তাকিম দিয়ে, এবং এই তওহীদের ভিত্তির ওপর দীনের এমারত তৈরী করার দায়িত্ব দিয়ে। কোন কোন নবীকে তার জাতি গ্রহণ কোরেছে, কোন নবীকে কিছু মানুষ গ্রহণ কোরেছে, কিছু আগের নবীর বিকৃত দীনটাকেই ধোরে রেখেছে, আর কোন নবীকে মানুষ এবলিসের প্ররোচনায় অস্বীকার কোরেছে, এমন কি হত্যাও কোরেছে (মায়েদা- ৭০)।

এই ভাবে নবী-রসুলদের আল্লাহর তওহীদ ও তওহীদ ভিত্তিক দীন প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতার শেষ প্রান্তে পৃথিবীতে আল্লাহ পাঠালেন তাঁর হাবিব মোহম্মদ (দঃ) বিন আবদুল্লাহকে (কোর'আন- সুরা আহযাব- ৪০)। পূর্ববর্ত্তী সব নবী-রসুলদের মত ইনিও সেই একই দায়িত্ব নিয়ে এলেন; আল্লাহর তওহীদ ভিত্তিক দীন মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা কোরতে। তফাৎ শুধু এইটুকু যে পুর্ববর্ত্তীদের দায়িত্ব ছিলো তাদের যার যার সমাজ, গোত্র, জাতির মধ্যে সীমিত, আর এই শেষ-নবীর দায়িত্ব হোলো সমস্ত পৃথিবীর (সুরা নেসা- ১৭০, সুরা ফোরকান- ১)।

এখন একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে আল্লাহ নবী-রসুলদের মাধ্যমে যে তওহীদ ভিত্তিক দীন মানব জাতির জন্য দান কোরেছেন এবং শেষ নবীও যেটা মানুষকে শেখালেন সেটা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, ওটার শুধু খোলসটা আছে। **আজ মোসলেম বোলে পরিচিত জাতিটি যেটাকে দীনুল এসলাম বোলে তাদের জীবনে পালন কোরছে সেটা নবীর শেখানো এসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত।** কাজেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটার যে জবাব আমি এখন দেব সেটা এই বিপরীতমুখী দীনের অনুসারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না; শুধুমাত্র আল্লাহ যাদের হেদায়াহ কোরবেন তারা ছাড়া।

আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দীন (জীবন-ব্যবস্থা) অবলুপ্ত কোরে দিয়ে এই সঠিক দিক নির্দেশনা (তওহীদ, সেরাতুল মুস্তাকিম) ও এই সত্যদীন (জীবন-ব্যবস্থা, শরিয়াহ) প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিলেন- এই সত্য আমরা পাচ্ছি প্রত্যক্ষ, সরাসরি কোর'আনে তিনটি আয়াত থেকে (কোর'আন- সুরা তওবা ৩৩, ফাতাহ ২৮, সফ ৯), এবং পরোক্ষভাবে সমস্ত কোর'আনে শত শত আয়াতে। প্রশ্নটি হোচ্ছে- **আল্লাহ শেষ নবীকে এই বিশাল দায়িত্ব দিলেন কিন্তু কেমন কোরে, কোন নীতিতে তিনি এ কাজ কোরবেন তা কি আল্লাহ তাঁকে বোলে দেবেন না?** আল্লাহ সোবহান, অর্থাৎ যার অণু পরিমাণও খুঁত, ত্রুটি, অক্ষমতা, অসম্পূর্ণতা বা চ্যুতি নেই। কাজেই তাঁর রসুলকে আল্লাহ এক বিরাট, বিশাল দায়িত্ব দিলেন কিন্তু কেমন কোরে, কোন্ প্রক্রিয়ায় তিনি তা কোরবেন তা বোলে দেবেন না, তা হোতেই পারে না। কাজেই আল্লাহ তাঁর নবীকে ঐ দায়িত্বের সঙ্গে ঐ কাজ করার নীতি ও প্রক্রিয়া অর্থাৎ তরিকাও বোলে দিলেন। **সমস্ত পৃথিবীতে**

আল্লাহর তওহীদ ভিত্তিক দীন প্রতিষ্ঠার নীতি হিসাবে আল্লাহ তাঁর রসুলকে দিলেন জেহাদ ও কেতাল- অর্থাৎ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সশস্ত্র সংগ্রাম; এবং ঐ নীতির ওপর ভিত্তি কোরে একটি পাঁচদফার কর্মসূচি। ঐ পাঁচ দফা হোল- ১) ঐক্য, ২) শৃংখলা, ৩) আনুগত্য, ৪) হেজরত, ৫) জেহাদ (সংগ্রাম) (হাদীস- তিরমিযী, মুসনাদে আহমেদ, বাব-উল-এমারাত, মেশকাত)। পৃথিবীতে প্রচলিত অন্য সমস্ত জীবন ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয় কোরে আল্লাহর দেয়া সঠিক দিক-নির্দেশনা ও সত্যদীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে যে নীতি ও তরিকা (প্রক্রিয়া, কর্মসূচি) দিলেন সেটা দাওয়াহ নয়; সেটা কঠিন জেহাদ, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সশস্ত্র সংগ্রাম।

এর প্রমাণ আল্লাহর কোর'আন এবং তাঁর রসুলের জীবনী, কথা ও কাজ। আল্লাহ তাঁর কোর'আনে সশস্ত্র সংগ্রাম অর্থাৎ যুদ্ধকে মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য ফরদে আইন কোরে দিয়েছেন সুরা বাকারার ২১৬ ও ২৪৪ নং আয়াতে, আনফালের ৩৯ নং ও আরও বহু আয়াতে। শুধু তাই নয় মো'মেন হবার সংজ্ঞার মধ্যেই তিনি জেহাদকে অন্তর্ভুক্ত কোরে দিয়েছেন। তিনি বোলেছেন- শুধু তারাই সত্যনিষ্ঠ মো'মেন যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর ঈমান এনেছে এবং তারপর আর কোন দ্বিধা-সন্দেহ করেনি এবং প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করেছে (কোর'আন- সুরা হুজরাত ১৫)। এই আয়াতে আল্লাহ মো'মেন হবার জন্য দু'টি শর্ত্ত রাখছেন। প্রথমটি হোল আল্লাহ ও তাঁর রসুলের উপর ঈমান; এটির অর্থ হোল জীবনের সর্ব অঙ্গনে- ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতীয়-আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, শিক্ষা- এক কথায় যে কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কোন বক্তব্য আছে, আদেশ-নিষেধ আছে সেখানে আর কাউকে গ্রহণ না করা, কারো নির্দেশ না মানা যা পেছনে বোলে এসেছি এবং এ ব্যাপারে বাকি জীবনে কোন দ্বিধা, কোন সন্দেহ না করা অর্থাৎ তওহীদ। দ্বিতীয়টি হোল আল্লাহর ঐ তওহীদ, সার্বভৌমত্বকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন ও সম্পদ দিয়ে সংগ্রাম, যুদ্ধ করা। কারণ ঐ তওহীদ এবং তওহীদ ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থা যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা না হয় তবে দীনই অর্থহীন, যেমন বর্ত্তমানের অবস্থা। এই দু'টি শর্ত্ত হোল মো'মেন হবার সংজ্ঞা। যার বা যাদের মধ্যে এই দু'টি শর্ত্ত পূরণ হোয়েছে সে বা তারা প্রকৃত মো'মেন আর যে বা যাদের মধ্যে এই দু'টির মধ্যে একটি বা দু'টিই শর্ত্ত পুরণ হয় নি, সে বা তারা প্রকৃত মো'মেন নয়; এবং **মো'মেন নয় মানেই হয় মোশরেক, না হয় কাফের।**

আল্লাহ জেহাদকে মো'মেন হবার সংজ্ঞার মধ্যে শর্ত্ত হিসাবে দিলেন, কেতাল অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামকে ফরদে আইন কোরে দিলেন, তারপর সরাসরি হুকুম দিলেন- সশস্ত্র সংগ্রাম (যুদ্ধ) করো (বাকারা ২৪৪)। আরও বোললেন- সশস্ত্র সংগ্রাম (যুদ্ধ) করতে থাকো তাদের বিরুদ্ধে যে পর্যন্ত না সমস্ত অন্যায় অশান্তি বিলোপ হোয়ে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা হয় (আনফাল ৩৯)। এইসব সরাসরি হুকুম ছাড়াও সমস্ত কোর'আনে আল্লাহ ছয়শত বারের বেশী সশস্ত্র সংগ্রামের উল্লেখ কোরেছেন। আল্লাহর এই নীতির প্রতিধ্বনি কোরে তার রসুল বোললেন- আমি আল্লাহর আদেশ পেয়েছি পৃথিবীর মানুষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম (যুদ্ধ) চালিয়ে যেতে যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয়

যে আল্লাহ ছাড়া এলাহ নেই এবং আমি মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল এবং সালাহ্ প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয় [হাদীস- আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রা:) থেকে বোখারী]। এছাড়াও আল্লাহ তাঁর কোর'আনে এবং আল্লাহর রসুল তাঁর জীবনের কাজে ও কথায় সন্দেহাতীত ভাবে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে আল্লাহর তওহীদ ভিত্তিক এই দীনুল এসলাম, দীনুল হককে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার নীতি হোচ্ছে সামরিক, অর্থাৎ জিহাদ, কেতাল। আল্লাহ নীতি হিসাবে যুদ্ধকে নির্দ্ধারণ কোরেছেন বোলেই তাঁর নির্দেশে তাঁর রসুল মাত্র সাড়ে নয় বছরের মধ্যে কম কোরে হোলেও ৭৮টি যুদ্ধ কোরেছেন।

দীন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তাঁর রসুলকে যে পাঁচ দফা কর্মসূচি দিয়েছেন তার প্রথম চার দফা অর্থাৎ ১) ঐক্য, ২) শৃংখলা, ৩) আনুগত্য, আদেশ প্রতিপালন, ৪) হেজরত হোল জেহাদ করার প্রস্তুতি এবং পঞ্চম দফা হোচ্ছে জেহাদ, সংগ্রাম। প্রথম চার দফা ছাড়া যুদ্ধ করা যাবে না। জেহাদকে, সশস্ত্র সংগ্রামকে আল্লাহ নীতি হিসাবে নির্দ্ধারণ কোরেছেন বোলেই এই দীনে শহীদ ও মোজাহেদদের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা কোরে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেয়ার অঙ্গীকার কোরেছেন, জান্নাত নিশ্চিত কোরে দিয়েছেন (কোর'আন- সুরা সফ ১০-১২), এমন নিশ্চয়তা এই জাতির, উম্মাহর আর কোন শ্রেণী বা প্রকারের মানুষকে তিনি দেন নি। আল্লাহর এই নীতি নির্দ্ধারণ তাঁর রসুল বুঝেছিলেন বোলেই তিনি ২৩ বছরের কঠোর সাধনায় যে সংগঠন গড়ে তুললেন সেটার ইতিহাস দেখলে সেটাকে একটি জাতি বলার চেয়ে একটি সামরিক বাহিনী বলাই বেশী সঙ্গত হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে এই বাহিনী তার জন্মলগ্ন থেকে শুরু কোরে প্রায় একশ' বছর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সশস্ত্র সংগ্রাম কোরে গেছে; এর সর্বাধিনায়ক (আল্লাহর রসুল) থেকে শুরু কোরে সাধারণ সৈনিক (মোজাহেদ) পর্যন্ত একটি মানুষও বোধহয় পাওয়া যেত না যার গায়ে অস্ত্রের আঘাত ছিলো না; হাজারে হাজারে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয়ার কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না।

তাহোলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক এই দীনকে সমস্ত পৃথিবীতে কার্যকর কোরে মানব জাতির জীবন থেকে সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ও রক্তপাত দূর কোরে শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠা করার জন্যই আল্লাহ তাঁর রসুলকে পৃথিবীতে পাঠালেন এবং ঐ কাজ করার **নীতি হিসাবে নির্দ্ধারিত কোরে দিলেন সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রাম এবং জেহাদ ভিত্তিক একটি ৫ দফার কর্মসুচি।** তাঁর রসুল ঐ নীতি ও কর্মসুচির অনুসরণ কোরে গড়ে তুললেন এক দুর্দম, দুর্ধর্ষ, অপরাজেয় সামরিক বাহিনী যার নাম হোল উম্মতে মোহাম্মদী। এই উপলব্ধি (আকীদা) থেকে আজ আমরা লক্ষকোটি মাইল দূরে অবস্থান নিয়েছি। এই কথা কোর'আন এবং হাদীস থেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করা যায়। কিন্তু তা কোরতে গেলে এই নিবন্ধ অতি বড় হোয়ে যাবে কাজেই আমি এখানেই এর ইতি টানবো। তবে ইতি টানার আগে দু'টি কথা না বোললেই নয়। একজন মানুষের এন্তেকালের সময় রেখে যাওয়া জিনিস-পত্র দেখেই ঐ মানুষটির সারা জীবনের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। যেমন- কোন লোকের মৃত্যুর পর তার ঘরে যদি শুধু মাত্র কয়েকটি পুরানো ইঞ্জিন, ড্রিল মেশিন, হাতুড়ী, রেঞ্জ

এগুলো পাওয়া যায় তাহোলে লোকটির পূর্ব পরিচয় জানা না থাকলেও লোকটি যে মোটর মিস্ত্রী বা ইঞ্জিনিয়ার ছিলো তা কাউকে বলে দিতে হয় না, লোকটির মৃত্যুর সময় রেখে যাওয়া জিনিসগুলো দেখে খুব সহজেই তা বুঝা যায়। আবার কেউ যদি তার মৃত্যুর সময় তার ঘরে শুধুমাত্র হারমোনিয়াম, তবলা, ঢোল, তানপুরা ইত্যাদি কতগুলো গানের সরঞ্জাম রেখে যায় তাহোলে ঐ লোকটি যে গায়ক ছিলো তাও কাউকে বোলে দিতে হয় না, লোকটির সাথে কোন পূর্ব পরিচয় না থাকলেও না। তেমনি কেউ মৃত্যুর সময় যদি শুধুমাত্র কতকগুলো যুদ্ধের সরঞ্জাম রেখে যায়, তাহোলে সে যে একজন যোদ্ধা ছিল তাতেও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

আল্লাহর শেষ রসুল এন্তেকালের সময় পার্থিব সম্পদ বোলতে রেখে যান (১) ১টি চাটাই, (২) ১ টি বালিশ (খেজুরের ছাল দিয়ে ভর্ত্তি) ও (৩) কয়েকটি মশক। আর রেখে যান- (১) ৯টি তরবারী, (২) ৫টি বর্শা, (৩) ১টি তীরকোষ, (৪) ৬টি ধনুক, (৫) ৭টি লৌহবর্ম, (৬) ৩টি জোব্বা (যুদ্ধের), (৭) ১টি কোমরবন্ধ, (৮) ১টি ঢাল এবং (৯) ৩টি পতাকা। (তথ্যসূত্র:- সিরাতুন্নবী- মওলানা শিবলী নোমানী)

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে তাঁর স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য কোরে এরশাদ করেছেন, হেদায়াহ ও সত্য দীন (জীবন-ব্যবস্থা)-সহ তোমাকে প্রেরণ কোরেছি এই জন্য যে, সমস্ত দীনের (জীবন-ব্যবস্থা) ওপর আমার এই দীনকে বিজয়ী কোরে দিবে (সুরা তওবা-৩৩, ফাতহ্-২৮, সফ-৯)। আর এ বিজয়ী করার পথ হিসাবে নীতি নির্দ্ধারণ কোরে দিলেন জিহাদ ও কেতাল (সশস্ত্র সংগ্রাম)। তাইতো মো'মেন হওয়ার শর্ত্ত হিসাবে রাখলেন, জিহাদ ও কেতালকে। এজন্যই আল্লাহর রাসুল বললেন, আমি আদিষ্ট হোয়েছি ততক্ষণ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে, যে পর্যন্ত না প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহকে তাদের একমাত্র এলাহ হিসাবে এবং আমাকে আল্লাহর রসুল হিসাবে মেনে না নেয় [আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে- বোখারী]। আর এ আদেশ পালন কোরতে যেয়ে আমাদের নেতা রাসূলকে মাত্র ৯-১০ বৎসরে ছোট-বড় ৭৮টি যুদ্ধ কোরতে হোয়েছে। একজন যোদ্ধা হিসাবে তাঁকে জীবন-যাপন কোরতে হোয়েছে; অর্থাৎ তিনি একজন যোদ্ধা ছিলেন। উপরোক্ত উদাহরণগুলোর আলোকে এ সত্যের সত্যায়ন করে তাঁর রেখে যাওয়া জিনিসগুলো।

আল্লাহর রসুলের মুখ নিঃসৃত বাণীর সাথেও রয়েছে এগুলোর অপূর্ব মিল। আল্লাহর রসুল বোলেছেন- আমি হোলাম যোদ্ধা নবী, আমি হোলাম দয়ার নবী (ইবনে তাইমিয়ার আস সিয়াসাহ আশ-শরীয়াহ, পৃষ্ঠা- ৮)

এ সম্বন্ধে আরও জানতে চাইলে আমার লেখা 'এ ইসলাম ইসলামই নয়' বইটি পড়া দরকার। আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত এসলামের যুগ অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সত্যদীনকে কার্যকরী কোরে সমস্ত পৃথিবীতে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠার যুগের পরবর্ত্তীতে ঐ সশস্ত্র সংগ্রাম ছেড়ে দেবার পর জেহাদ, কেতালকে আত্মরক্ষামূলক বোলে প্রচার চালানো হয় ও তা গৃহীত হয়। শুধু তাই নয়, এমন কি বর্ত্তমানে এই জাতির কাছে ওটা কোন প্রয়োজনীয় কাজ নয় বোলেই

বিশ্বাস করা হয়। মোসলেম বোলে পরিচিত এই জাতির এখন মনে নেই যে মো'মেন হবার সংজ্ঞার মধ্যেই যে জেহাদকে আল্লাহ অন্তর্ভুক্ত কোরে দিয়েছেন সে জেহাদকে শুধু আত্মরক্ষামূলক বলা বা প্রয়োজন নেই মনে কোরলে আর মো'মেন থাকা যায় না এবং মো'মেন না থাকার মানেই হয় মোশরেক না হয় কাফের হোয়ে যাওয়া যার পর আর সালাহ্-সওম (নামায-রোযা) সহ কোন এবাদতেরই আর কোন অর্থ থাকে না।

আল্লাহর আরেকটি কথাও মোসলেম ও মো'মেন হবার দাবীদার এ জাতির মনে নেই, তাদের ভুলিয়ে দেয়া হোয়েছে যে আল্লাহ বোলেছেন- তোমরা যদি (সামরিক) অভিযানে (অর্থাৎ দীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য) বের হওয়া ত্যাগ করো তবে তোমাদের কঠিন শাস্তি দেব এবং তোমাদের বদলে অন্য জাতিকে মনোনীত কোরবো; তোমরা তাঁর (আল্লাহর) কোন ক্ষতি কোরতে পারবেনা (কারণ) আল্লাহ সর্বশক্তিমান (সুরা আত তওবা ৩৮-৩৯)। রসুলের ওপর আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব সশস্ত্র সংগ্রাম কোরে সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠার জন্য বের হোয়ে পড়া ছেড়ে দিলে আল্লাহ কী কোরবেন বোলে সাবধান কোরছেন তা লক্ষ্য করুন। আল্লাহ দু'টো কথা বোলছেন- প্রথমটা কঠিন শাস্তি দেবেন, দ্বিতীয়টা এই জাতিকে ত্যাগ কোরে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠা কোরবেন অর্থাৎ তাদের হাতে কর্তৃত্ব দেবেন। দু'টো শাস্তিই প্রমাণ করে যে **জেহাদ ত্যাগ কোরলে আর মো'মেন থাকা যায় না।** কারণ প্রথমটি অর্থাৎ কঠিন শাস্তি আল্লাহ কখনও মো'মেনকে দেবেন না। আল্লাহ বোলছেন তিনি তাঁর মালায়েকদের নিয়ে মো'মেনদের ওপর সালাম পাঠান (সুরা আহযাব- ৪৩)। যাদের ওপর আল্লাহ একা নন, তাঁর কোটি কোটি, অসংখ্য মালায়েকদেরসহ সালাম পাঠান তাদের তিনি কঠিন শাস্তি দেবেন? অবশ্যই নয়। এ ছাড়াও হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বোলছেন- আমার কাছে একজন মো'মেনের সম্মান ও মরতবা আমার কাবার চেয়েও উর্দ্ধে। যাদের সম্মান ও মরতবা আল্লাহর কাছে তাঁর কাবা ঘরের উর্দ্ধে, যাদের ওপর তিনি তাঁর অসংখ্য মালায়েকদের (ফেরেশতা) নিয়ে সালাম পাঠান তাদের তিনি অবশ্যই কঠিন শাস্তি দেবেন না। তাঁর শাস্তি অর্থই এই দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই।

দ্বিতীয়ত তিনি বোলছেন- তোমাদের বদলে অন্য জাতিকে মনোনীত কোরব অর্থাৎ তোমাদের পরিত্যাগ কোরব, তোমাদের বহিষকৃত কোরব, বিতাড়িত কোরব। আল্লাহ যাদের পরিত্যাগ কোরবেন, বহিষ্কৃত কোরে বাদ দিয়ে অন্য জাতি মনোনীত কোরবেন তারা কি আর মো'মেন থাকবে? অবশ্যই নয়। আল্লাহর প্রতিশ্রুত দু'টো শাস্তি থেকেই দেখা যাচ্ছে যে জেহাদ, সশস্ত্র **সংগ্রাম ত্যাগ কোরলে আল্লাহ আর মো'মেন বোলে গ্রহণ কোরবেন না।** আরও লক্ষ্য করার বিষয় হোচ্ছে যে আল্লাহ কোথাও বলেন নাই যে সালাহ্ (নামায) ত্যাগ কোরলে বা সওম (রোযা) ত্যাগ কোরলে বা হজ্ব ত্যাগ কোরলে বা অন্য যে কোন এবাদত ত্যাগ কোরলে কঠিন শাস্তি দিয়ে এই দীন থেকেই বহিষ্কৃত কোরবেন, শুধু জেহাদ (সংগ্রাম) এবং আল্লাহর রাস্তায় (জেহাদে) ব্যয় ছাড়া (সুরা মুহাম্মদ ৩৮)।

মোসলেম বোলে পরিচিত ১৫০ কোটির এই জাতির অন্য সমস্ত জাতি দ্বারা পরাজিত, লান্ছিত, অপমানিত, ঘৃণিত হবার পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমাদের পরিষ্কার কোরে বোঝা প্রয়োজনীয় হোয়ে পড়েছে যে জেহাদ ত্যাগ কোরলে **'কঠিন শাস্তি'** ও আমাদের **'পরিত্যাগ কোরে অন্য কোনও জাতিকে মনোনীত'** আল্লাহ কেন কোরবেন। সালাহ্ (নামায), যাকাহ, সওম (রোযা), হজ্ব ইত্যাদি দীনের হাজারো রকমের এবাদতের কোনটাই ত্যাগ কোরলে একত্রে 'কঠিন শাস্তি ও তারপর বহিষ্কার' করার মত শাস্তি আল্লাহ বলেন নি। কিন্তু জেহাদ ছাড়লে তাই দেবেন বোলে জানিয়ে দিয়েছেন, সতর্ক কোরেছেন। কারণ হোল-

ক) মো'মেনের সংজ্ঞা অর্থাৎ মো'মেন হবার শর্ত্তের মধ্যেই আল্লাহ ঈমানের সঙ্গে জেহাদকে অন্তর্ভুক্ত কোরে দিয়েছেন। কারণ দীন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার নীতি হিসাবে তিনি জেহাদকে, কেতালকে (সশস্ত্র সংগ্রাম) নির্দ্ধারিত কোরে দিয়েছেন। জেহাদ ত্যাগ কোরলে মো'মেনের সংজ্ঞার মধ্যেই থাকা যায় না, আর মো'মেনের সংজ্ঞার মধ্যে না থাকলে অবশ্যই হয় মোশরেক কিম্বা কাফের। সে যতই সালাহ্ (নামায) পড়ুক, যতই সওম (রোযা) পালন কোরুক; আল্লাহর দৃষ্টিতে সে আর মো'মেন নয় এবং মোশরেক আর কাফেরদের জন্য আল্লাহর নির্দ্ধারিত শাস্তি অবশ্যই কঠিন, আল্লাহর বহুঘোষিত জাহান্নাম।

খ) এই জাতির বদলে অন্য কোনও জাতি মনোনীত কোরবেন, অর্থাৎ অন্য কোন জাতিকে এই জাতির ওপর কর্ত্তৃত্ব দান কোরবেন। কারণ পরিষ্কার- **যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে পাঠিয়ে এই জাতি, উম্মাহ গঠন কোরলেন, এই জাতি যদি সেই উদ্দেশ্যটিকেই ছেড়ে দেয় তাহোলে আল্লাহর কাছে সেই জাতির এবং অন্য কোন এবাদতের আর কোন প্রয়োজন থাকে না।** পেছনে দেখিয়ে এসেছি যে সেই কাজটি হোল জেহাদের মাধ্যমে অন্য সমস্ত রকমের জীবন বিধানের অবসান, বিলুপ্তি ঘটিয়ে শেষনবীর মাধ্যমে এসলামের এই শেষ বিধান, শেষ সংস্করণ পৃথিবীতে কার্যকর কোরে সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠা কোরে এবলিসের চ্যালেঞ্জে এবলিসকে পরাজিত কোরে আল্লাহকে জয়ী করা। ঈমানের অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর সর্বব্যাপী বিশ্বাস আনার পরই যে কাজটি নির্দ্ধারিত করা হোয়েছে তা হোল জেহাদ, এই দীনকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম (কোর'আন- সুরা হুজরাত ১৫)। সেই কাজটি ছেড়ে দিলে এ জাতির অস্তিত্ব থাকারই আর প্রয়োজন থাকে না; তাই আল্লাহ এ জাতিকে সতর্ক কোরে দিয়েছেন জেহাদ ছেড়ে দিলে তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে অন্য জাতিকে অধিকার ও কর্ত্তৃত্ব দেবেন।

আল্লাহ যে শুধু ভয় দেখাবার জন্যই এই জাতিকে এই কথা বোললেন তা যে নয়, তার প্রমাণ হোল পরবর্ত্তী ইতিহাস। সে ইতিহাস হোচ্ছে এই যে, জাতিগতভাবে জেহাদ ছেড়ে দেবার শাস্তি হিসাবে ইউরোপের বিভিন্ন খ্রীস্টান রাষ্ট্রগুলিকে দিয়ে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তীরে মরক্কো থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ফিলিপাইন পর্যন্ত সমস্ত মোসলেম রাষ্ট্রগুলিকে সামরিকভাবে পরাজিত কোরে খ্রীস্টানদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত কোরে দিলেন, অর্থাৎ সমস্ত মোসলেম দুনিয়াকে খ্রীস্টানদের গোলামে, দাসে পরিণত কোরে দিয়ে তাঁর হুশিয়ারি, প্রতিশ্রুতি পালন কোরলেন। এই সরাসরি দাসত্বের

বাইরে রোইলো শুধু হেজাজ, আল্লাহর ঘর কাবা এবং তাঁর রসুলের পবিত্র রওযা। খ্রীস্টান শক্তিগুলি যদি ওগুলিও দখল কোরতে চাইত তবে বাধা দেবার শক্তি একদা অপরাজেয় এই জাতির ছিলো না। আমার মতে আল্লাহ শুধু মধ্য আরবটুকু খ্রীস্টানদের হাতে তুলে দিলেন না তাঁর নিজের ঘর এবং তাঁর হাবিবের রওযার সম্মানে। যারা ইতিহাস পড়েছেন তারা উপলব্ধি কোরবেন যে ইউরোপের খ্রীস্টান শক্তিগুলি যখন এই মোসলেম উম্মাহকে সামরিকভাবে পরাজিত কোরে কয়েকশ' বছর তাদের ওপর প্রভুত্ব কোরেছে তখন আল্লাহর সতর্কবাণী- "তোমাদের কঠিন শাস্তি (আযাবুন আলীমা) দেব" কেমন কোরে সত্য হোয়েছে। তাদের সামরিক আক্রমণ, যুদ্ধ ও শাসনকালে সমস্ত মোসলেম দুনিয়ায় তারা এই জাতিকে গুলি কোরে, বেয়োনেট দিয়ে বিদ্ধ কোরে, আগুনে পুড়িয়ে, লাইন কোরে দাঁড় কোরিয়ে মেশিনগান কোরে, জীবন্ত কবর দিয়ে, ট্যাংকের তলায় পিষে হত্যা কোরেছে, এই জাতির মেয়েদের ধোরে নিয়ে ইউরোপে, আফ্রিকায় ও বিভিন্ন দেশের বেশ্যালয়ে বিক্রি কোরেছে; জেল, ফাঁসির তো কথাই নেই। আল্লাহর ঐ শাস্তি আজও শেষ হয় নাই। আজ ইউরোপীয় খ্রীস্টানদের সরাসরি শাসন নেই কিন্তু এই জাতি আজও রাজনৈতিক, কুটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, শিক্ষা, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি এক কথায় সর্বতোভাবে ইউরোপ-আমেরিকার দাস হোয়েই আছে। আজও এই জাতি শুধু ইউরোপে নয়, পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলি দিয়ে পরাজিত, অপমানিত, লান্ছিত হোচ্ছে। এই জাতি তার প্রভু আল্লাহর সতর্কবাণীর অর্থ আজও বোঝে নাই; আজও জেহাদ বিমুখ হোয়ে হাজারো রকমের 'এবাদত' নিয়ে মশগুল আছে। আজও সে মো'মেনের সংজ্ঞায় ফিরে যায় নি, এবং আজও আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সেই শাস্তি দিয়েই চোলেছেন এবং আখেরাতে জাহান্নামে আরও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা কোরে রেখেছেন, কোনও নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত সে আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না।

এখন আমরা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে যেহেতু মো'মেন হবার সংজ্ঞা ও শর্ত্তের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর সর্বব্যাপী বিশ্বাসের (ঈমান) সঙ্গে জেহাদকে অন্তভুক্ত কোরে দিয়েছেন (সুরা হুজরাত, আয়াত ১৫), জেহাদকে ফরদে আইন কোরে দিয়েছেন (সুরা বাকারা ২১৬), সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রামের হুকুম দিয়েছেন (সুরা বাকারা ২৪৪, সুরা আনফাল ৩৯ এবং কোর'আনের আরও অনেক স্থানে) ছয়শ' বাইশ বারেরও বেশী সশস্ত্র সংগ্রাম, কেতাল, যুদ্ধ সম্বন্ধে উল্লেখ কোরেছেন, যুদ্ধ কোরে জীবন বিসর্জন যে দেবে তার জন্য এই দীনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান নির্দ্ধারণ কোরে দিয়েছেন, যেহেতু জেহাদ ত্যাগ কোরলে আল্লাহ ভয়াবহ শাস্তি দিয়ে বিতাড়িত কোরবেন, বহিষকৃত কোরবেন বোলে হুশিয়ার কোরেছেন (তওবা ৩৮-৩৯), সেহেতু এই দীনের মধ্যে প্রবেশ কোরতেই একজন মানুষকে যোদ্ধা হোতে হবে, যোদ্ধা না হোয়ে কেউ এই দীনে প্রবেশই কোরতে পারবে না। **অর্থাৎ যে যোদ্ধা নয় এই দীনুল এসলামের একজন প্রাথমিক সদস্য হওয়ারও যোগ্যতা তার নেই।** ভালো বা উচ্চস্তরের সদস্য হওয়া তো দূরের কথা। এক কথায় বলা যায় যে এই শেষ এসলামে প্রবেশ করার জন্য, আল্লাহর

কাছে মো'মেন বোলে গৃহীত হবার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর ঈমানের (বিশ্বাস) সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে একজন নির্ভিক দুর্জয় যোদ্ধায় রূপান্তরিত কোরতে হবে এবং নিজের প্রাণ ও পার্থিব সম্পদ দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম কোরতে হবে; নইলে কোন লোক মো'মেন বোলে আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না, সে যত বড় মুত্তাকি (পরহেযগার)-ই হোক।

আল্লাহ তাঁর রসুলকে হুকুম দিলেন- পৃথিবীতে প্রচলিত সব রকম জীবন-ব্যবস্থাকে (দীন) নিষ্ক্রিয়, অচল কোরে দিয়ে আমার দেয়া এই সঠিক দিক নির্দেশনা ও সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠা করো; এজন্যই তোমাকে পৃথিবীতে পাঠানো হোয়েছে (কোর'আন- সুরা তওবা ৩৩, সুরা ফাতাহ ২৮, সুরা সফ ৯)। এ কাজ কেমন কোরে, কী প্রক্রিয়ায় তাঁর রসুল কোরবেন তাও তিনি তাঁকে জানিয়ে দিলেন- এ কাজের নীতি হিসাবে তিনি নির্দিষ্ট কোরে দিলেন; ইনিয়ে বিনিয়ে অনুরোধ কোরে নয়; এই দিক নির্দেশনা ও সত্যদীন যে অন্যান্য জীবন-ব্যবস্থার (দীন) চেয়ে উৎকৃষ্ট এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা কোরে নয়, মিটিং-মিছিল কোরে নয়, নির্বাচন কোরে নয়, দেয়ালে প্রচার পত্র সেটে নয়, স্লোগান দিয়ে নয়, যুক্তি-তর্ক কোরে নয়, তাবলিগ, প্রচার কোরে নয়; জেহাদ ও কেতাল, সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রাম কোরে। আরও বোললেন- **তোমার জাতিকে, উম্মাহকে, মো'মেনদের যুদ্ধ কোরতে উদ্বুদ্ধ করো** (সুরা আনফাল ৬৫)। আদেশ পেয়ে আল্লাহর রসুল বোললেন- আমি আদেশ পেয়েছি পৃথিবীর মানুষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম কোরে যেতে যে পর্যন্ত না সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আল্লাহর তওহীদ ও আমাকে আল্লাহর রসুল বোলে স্বীকার কোরে নেয় [হাদীস- আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা:) থেকে বোখারী, মেশকাত] । আল্লাহর এই আদেশ বাস্তবায়ন কোরতে যেয়ে তাঁর **রসুল এক দুর্ধর্ষ মৃত্যুভয়হীন, অজেয় বাহিনী গঠন কোরলেন যার নাম উম্মতে মোহাম্মদী এবং ঐ বাহিনী নিয়ে মাত্র সাড়ে নয় বছরের মধ্যে ৭৮টি যুদ্ধ কোরে** সমস্ত আরব উপদ্বীপে আল্লাহর দেয়া সঠিক দিক নির্দেশনা ও সত্যদীন প্রতিষ্ঠা কোরে এসলাম (শান্তি) প্রতিষ্ঠা কোরলেন। তাঁর সংগঠিত উম্মতে মোহাম্মদীও বুঝেছিলো, শুধু বুঝেছিলো নয়, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি কোরেছিলো তাদের কর্ত্তব্য কী, উদ্দেশ্য কী, কেন তাদের আল্লাহর রসুল সংগঠিত কোরেছিলেন। তাই রসুলের পৃথিবী থেকে চলে যাবার পর তাঁর উম্মাহ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার, দোকান-পাট, স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন এক কথায় পার্থিব সব কিছু ত্যাগ কোরে অস্ত্র হাতে পৃথিবীতে বের হোয়ে পোড়েছিলেন তাদের নেতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত কোরতে। আল্লাহর সেই কঠোর ধম্‌কি, সতর্কবাণী সর্বদা তাদের মনে ভয় জাগরিত, ভীত কোরে রাখতো যে আল্লাহ বোলেছেন- তোমরা জেহাদের অভিযানে বের হওয়া ত্যাগ কোরলে তোমাদের কঠিন শাস্তি দেব এবং তোমাদের বদলে অন্য জাতিকে মনোনীত কোরব; তোমরা তাঁর (আল্লাহর) কোন ক্ষতি কোরতে পারবেনা (কারণ) আল্লাহ সর্বশক্তিমান (সুরা তওবা- ৩৮, ৩৯)।

এখন দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হোচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রাম কোরে পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া দিক নির্দেশনা ও সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠার মত বিশাল ও কঠিন কাজের জন্য **আল্লাহর হুকুমে তাঁর রসুল যে বাহিনী গঠন কোরলেন, যার নাম হোল উম্মতে মোহাম্মদী তার চরিত্র গঠন ও প্রশিক্ষণের জন্য কি ব্যবস্থা**

করা হোল? এটা হোতে পারেনা যে আল্লাহ তাঁর রসুলকে উম্মাহ গঠন কোরতে আদেশ দিলেন, যুদ্ধকে ফরদে আইন কোরে দিলেন, পৃথিবীতে দীন প্রতিষ্ঠার নীতি ও প্রক্রিয়া হিসাবে যুদ্ধকেই নির্দিষ্ট কোরে দিলেন, কিন্তু তাদের জন্য যুদ্ধের কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা দিলেন না। যে কথাটা সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে কোন কাজ কোরতে গেলেই সেই কাজের প্রশিক্ষণ অত্যাবশ্যক, আল্লাহ সোবহানুতায়ালা কি এই কথাটা বোঝেন নি? তাহোলে এই দীনে সেই প্রশিক্ষণ কোথায়? প্রত্যেক জাতিরই সামরিক বাহিনী আছে এবং প্রত্যেকেরই যুদ্ধের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। তাদের দৈনিক প্যারেড, কুচকাওয়াজ, অস্ত্রের ব্যবহারের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ওগুলো ছাড়া কোন সামরিক বাহিনী নেই। তাহোলে আল্লাহর রসুল যে সামরিক বাহিনী গঠন কোরলেন, যে বাহিনী যুদ্ধ কোরে ৯ বছরের মধ্যে সমস্ত আরব উপদ্বীপ জয় কোরলো, তারপর মাত্র ৬০/৭০ বছরের মধ্যে তৎকালীন পৃথিবীর দুই বিশ্বশক্তির সুশিক্ষিত বিশাল সামরিক বাহিনীগুলিকে যুদ্ধে পরাজিত কোরে অর্দ্ধেক পৃথিবীতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা কোরলো তারা এ সব কিছু প্রশিক্ষণ ছাড়াই করলো? এ হোতে পারে? অবশ্যই নয়। একথা সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে, **যে দীনে, জীবন-ব্যবস্থায় যুদ্ধকে ফরদে আইন, অবশ্য করণীয় কোরে দেয়া হোয়েছে** (কোর'আন- সুরা বাকারা ২১৬) **সে দীনে প্রশিক্ষণকেও অবশ্য করণীয়, ফরদে আইন কোরে দেয়া হবে।** আল্লাহ ভুল করেন নি, তিনি সোবহান, তিনি সামান্যতম ভুলও কোরতে পারেন না, আর এতবড় ভুল তো কথাই নেই।

তাহোলে সে প্রশিক্ষণ কোথায়?

সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ হোল- সালাহ্

সালাতের উদ্দেশ্য কী? বিশ্বনবী আল্লাহর নির্দেশে যে উম্মাহ, জাতি গঠন কোরলেন যে জাতিটাকে একটা জাতি না বোলে একটা সামরিক বাহিনী বলাই সঠিক হয়, সেই জাতির আকীদাতে সালাতের উদ্দেশ্য ও অর্থ সঠিক ছিলো; অর্থাৎ সেই জাতির, সেই বাহিনীর একজন হোতে গেলে যে চরিত্রের প্রয়োজন সেই চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ হোচ্ছে এই সালাহ্। সালাহ্ সম্বন্ধে এই সঠিক আকীদা চালু ছিলো যত দিন এই বাহিনী নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ কোরে গেছে; অর্থাৎ রসুলের পর ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত। তারপর এই উম্মাহর শাসকরা আল্লাহর আদেশ ও সাবধান বাণী ভুলে যেয়ে যখন সশস্ত্র সংগ্রাম ত্যাগ কোরে মো'মেন মোজাহেদের প্রাণ, সম্পদ ও রক্তের বিনিময়ে প্রাপ্ত বিশাল এলাকা অন্যান্য রাজা-বাদশাদের মত ভোগ কোরতে বসলেন, আলেমরা, পণ্ডিতরা কোর'আনের আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কোরতে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে খাতা কলম নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, আর তাসাওয়াফপন্থীরা অস্ত্র ফেলে দিয়ে তসবিহ নিয়ে নফ্স্ পরিষ্কার কোরতে হুজরায়, খানকায় ঢুকলেন তখন স্বভাবতই প্রয়োজন হোয়ে পড়লো নবীর শেখানো এই দীনের আকীদার কতকগুলি পরিবর্ত্তন করা। তাদের মনে রোইলনা যে তারাই বোলেছেন যে আকীদা সঠিক না হোলে, ভুল হোলে ঈমান, আমল, কিছুরই আর অর্থ থাকে না। পরিবর্ত্তন করাও হোল এবং ঐ পরিবর্ত্তনের ফলে এই সামরিক দীন পৃথিবীর অন্যান্য অসামরিক দীনের পর্যায়ে পর্যবসিত হোল অর্থাৎ খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, ইহুদী, জৈন ইত্যাদি বহু দীনের (ধর্মের) মতো আরেকটি ধর্মে পরিণত হোল যেটার উদ্দেশ্য এবাদত, পূজা, উপাসনা কোরে আত্মার চর্চা করা; রসুল যে সুশৃংখল, মৃত্যুভয়হীন দুর্ধর্ষ যোদ্ধার চরিত্রের সৃষ্টি কোরেছিলেন তার বদলে ষড়রিপুজয়ী ভীরু কাপুরুষ সাত্ত্বিকের দল তৈরী করা। সুতরাং অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রশিক্ষণ সালাহ্ বদলে হোয়ে গেলো এবাদত, উপাসনা, ধ্যান করা, রসুলের সুন্নাহ তাঁর ১০ বছরে ৭৮ টি যুদ্ধ থেকে বদলে হোয়ে গেলো দাড়ি রাখা, গোফ ছাটা, দাঁত মেসওয়াক করা, মিষ্টি খাওয়া, কুলুখ নেয়া, খানকায় ঢুকে তসবিহ জপা, মোরাকাবা, মোশাহেদা করা ইত্যাদি। এ বিষয়ে সম্যক ধারণার জন্য আমার লেখা **"এ ইসলাম ইসলামই নয়"** বইটি পড়া প্রয়োজন।

আশ্চর্য লাগে, সালাতের উদ্দেশ্যকে কী কোরে অন্যান্য ধর্মের উপাসনার সাথে এক কোরে ফেলা হোল, কারণ অন্যান্য ধর্মের উপাসনার পদ্ধতিগুলো থেকে সালাতের প্রক্রিয়া পদ্ধতি শুধু ভিন্ন নয়, একেবারে বিপরীত। অন্যান্য ধর্মের পদ্ধতিগুলো অন্তর্মূখী, জড়; কোনটা পদ্মাসনে বোসে চোখ বন্ধ কোরে ধ্যান করা, কোনটা জোড় হাতে হাটু গেড়ে বোসে চোখ বন্ধ কোরে স্রষ্টাকে ধ্যান করা, কোনটা সংসার ত্যাগ কোরে বনে যেয়ে সাধনা করা, কোনটা নির্জন স্থানে বা বদ্ধ ঘরে স্থির হোয়ে বসে প্রভুর ধ্যান করা ইত্যাদি নানা প্রকারের; আর সালাতে সবাই একত্র হোয়ে সোজা লাইন কোরে দাঁড়িয়ে শরীর, মেরুদণ্ড, ঘাড় দৃঢ়ভাবে লোহার রডের মত অনমনীয় রেখে নেতার

আদেশের (তকবীর) সঙ্গে সঙ্গে রুকু, সাজদা, সালাম ইত্যাদি করা। এই বিপরীতমুখী দু'টি জিনিসকে, যেটা সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে বিপরীত, সে দু'টোকে একই জিনিস মনে করা কী কোরে সম্ভব! কিন্তু আবার চিন্তা কোরলে আশ্চর্য লাগে না; কারণ জেহাদ ত্যাগ কোরলে আল্লাহ যে শাস্তি দেবেন বোলে সাবধান কোরেছেন তা হোল কঠিন শাস্তি ও আমাদের বহিষকৃত, বিতাড়িত, কোরে অন্য জাতিকে মনোনীত করা। জেহাদ ত্যাগ করার ফলে আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মোসলেম বোলে পরিচিত এই জাতিকে কঠিন শাস্তি দিয়ে অন্য জাতি অর্থাৎ ইউরোপের খ্রীস্টান জাতিগুলিকে এই জাতির প্রভু বানিয়ে দিলেন। তাঁর "কঠিন শাস্তির" মধ্যে বহুবিধ শাস্তির মধ্যে এও একটা যে জাতির সাধারণ জ্ঞানও লোপ পাবে। তাই হোয়েছে; নইলে সামরিক বাহিনীর প্যারেড, কুচকাওয়াজের মত একটা কাজকে অন্যান্য ধর্মের স্থবির উপাসনার সঙ্গে এক কোরে ফেলা কী কোরে সম্ভব!

কেতাল অর্থাৎ যুদ্ধকে যেমন আল্লাহ ফরদে আইন কোরে দিয়েছেন (সুরা বাকারা- ২১৬), তেমনি আল্লাহ সালাহ্-কেও ফরদে আইন কোরে দিয়েছেন আমাদের জন্য। কারণ যুদ্ধ প্রশিক্ষণ ছাড়া অসম্ভব। কিন্তু সালাতের প্রশিক্ষণ শুধু আমাদের যুদ্ধ শেখায় না, সালাহ্ চারিত্রিক, দৈহিক, মানসিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক বহু প্রকারের শিক্ষা দেয় যদিও যুদ্ধের প্রশিক্ষণটাই প্রথম ও **মুখ্য। সালাতের দৃশ্য পৃথিবীতে আর একটি মাত্র দৃশ্যের সঙ্গে মিলে, আর কিছুর সাথেই মিলে না, আর সেটি হোচ্ছে পৃথিবীর যে কোন সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজের সঙ্গে।** এই সাদৃশ্য এতই প্রকট যে বর্ত্তমানের এই প্রায়ান্ধ এসলামের দৃষ্টিতেও তা ধরা পড়ে। যেমন ডিগ্রী ইসলামিক স্টাডিজের *(Degree Islamic Studies)* তৃতীয় প্রত্রের অনুশীলনের ৬ষ্ঠ প্রশ্নের ১৮নং উত্তরে লেখা হোচ্ছে- "মসজিদ নেতৃত্ব ও নেতার আনুগত্যের শিক্ষা দেয়: মসজিদ নেতৃত্ব ও আনুগত্যের এক অনুপম শিক্ষা কেন্দ্র। মসজিদ সব মুসুল্লীর একই এমামের পেছনে সারিবদ্ধভাবে উঠাবসা দৃশ্য দেখে মনে হয় তারা একজন সেনাপতির নির্দেশে কুচকাওয়াজে লিপ্ত। এখানেই নেতার প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্য ও নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যের উত্তম সবক বিদ্যমান।" এই মিল স্বাভাবিক, কারণ দু'টোরই উদ্দেশ্য এক- 'যুদ্ধ'। শুধু তফাৎ এই যে কেন যুদ্ধ? পৃথিবীর সব সামরিক বাহিনীগুলির প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হোচ্ছে তাদের ভৌগলিক রাষ্ট্রগুলির রক্ষা এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রয়োজনে অন্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ কোরে দখল করা; আর এই উম্মতে মোহাম্মদীর প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে- সশস্ত্র সংগ্রাম কোরে সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর তওহীদ ভিত্তিক দীন কার্যকর কোরে মানব জাতির মধ্যেকার সমস্ত অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, অশান্তি, রক্তপাত দূর কোরে শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠা কোরে এবলিসের চ্যালেঞ্জে তাকে পরাজিত কোরে আল্লাহকে জয়ী করা। উদ্দেশ্যের মধ্যে আসমান-যমীন তফাৎ থাকলেও প্রক্রিয়া দু'টোরই এক- প্রশিক্ষণ। আকীদার বিকৃতির কারণে সালাহ্-কে শুধু একটি এবাদত, একটি আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া হিসাবে নেয়া যে কতখানি আহাম্মুকী তার কয়েকটি কারণ পেশ কোরছি।

১। আত্মশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন পাহাড়-পর্বতের গুহায় না হয় হুজরায়-খানকায় অন্ততপক্ষে কোন নির্জন স্থান, যেখানে স্থির হোয়ে বোসে, চোখ বন্ধ কোরে মন নিবিষ্ট কোরে, একাগ্রচিত্ত হোয়ে আল্লাহর ধ্যান করা। সালাতের প্রক্রিয়া এর প্রত্যেকটারই একেবারে বিপরীত। নির্জন স্থানে না হোয়ে সালাতের জন্য স্থান নির্দ্ধারণ আল্লাহ কোরেছেন জামাতে, জনসমাবেশে এবং সে সমাবেশ যত বড় হবে তত সওয়াব, তত পূন্য; অর্থাৎ একেবারে বিপরীত। একা সালাহ্ কায়েম করা শুধুমাত্র ব্যতিক্রম, যেখানে জামাতে যোগদান সম্ভব নয়; এবং তাও ঐ প্রশিক্ষণের অভ্যাস ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে।

ইতোপূর্বে আমি বোলে এসেছি, সালাহ দৈহিক এবং আত্মিক এই উভয়েরই সংস্কার এবং উন্নয়নের প্রক্রিয়া এবং প্রশিক্ষণ। জামাতে সালাহয় এই উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। একা একা সালাহ কায়েম কোরলে এর শুধু ব্যক্তিগতভাবে আত্মিক উন্নতি হয়। কাজেই প্রকৃতপক্ষে ফরদ সালাহ শুধুমাত্র দলবদ্ধভাবে অর্থাৎ জামাতে করাই সঠিক। জামাতে সালাহ কায়েম করা অসম্ভব হোলে শুধুমাত্র তখন ফরদ সালাহ একা একা কায়েম করা কর্ত্তব্য। এজন্যই অনেক হাদীসেই আমরা পাই যে, ফরদ সালাহ জামাতে কায়েম করা একা কায়েম করার চেয়ে বহুগুণ বেশী সওয়াব।

২। লাইন কোরে দাঁড়াতে হবে এবং সে লাইন হোতে হবে ধনুকের ছিলার মত সোজা, ধনুকের ছিলার চেয়ে সোজা আর কোন জিনিস নেই, হোতে পারে না। লাইন যদি ধনুকের ছিলার মত সোজা না হয় তবে যারা সালাহ্ পড়ছে তাদের ঘাড়, মুখ আল্লাহ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেবেন (শাস্তি হিসাবে) [হাদীস- নোমান বিন বশীর (রা:) থেকে মোসলেম এবং আবু মাসউদ আল আনসারী (রা:) থেকে মোসলেম, মেশকাত]। সালাতের লাইন ধনুকের ছিলার মত সোজা করার জন্য আল্লাহর রসুলের অনেকগুলি হাদীস আছে।

ধনুকের ছিলার মত সোজা লাইন কোরেও দুই তিন রাকাত সালাহ্ কায়েম করার পর অর্থাৎ দু' তিন বার ওঠাবসা করার পর ঐ সোজা লাইন আঁকা-বাঁকা হোয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক সময় হয়ও। এটা যাতে না হয় সালাতের শেষ পর্যন্ত যেন লাইন একদম শুরুর মতই সোজা থাকে সে জন্য রসুলের দেয়া নিয়ম হোচ্ছে এই যে লাইন ধনুকের ছিলার মত সোজা কোরে সালাহ্ আরম্ভ করা থেকে শেষ পর্যন্ত ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি (বুড়া আংগুল) এক স্থানে নিবদ্ধ রাখতে হবে- শুধু ডান পায়ের। অর্থাৎ সালাতের আরম্ভের সময় ডান পায়ের বুড়া আংগুল যে জায়গায় থাকবে সেখান থেকে একচুল নড়বে না- মাটিতে খোঁটা গাড়লে যেমন খোঁটা আর সেখান থেকে নড়ে না, তেমনি সালাতের ওঠাবসার সময়ও ডান পায়ের বুড়া আংগুল খোঁটার মত এক জায়গায় নিবদ্ধ রাখতে হবে। তাহোলেই সালাতের সোজা লাইন আর একটুকুও আঁকাবাঁকা হবে না। এটা কোরতে হবে প্রত্যেক মুসুল্লীর, মোজাহিদের। যার বুড়া আংগুল খোঁটার মত এক জায়গায় নিবদ্ধ থাকবে না সে লাইন থেকে হয় সামনে না হয় পেছনে সরে যাবে, এবং লাইন

আঁকাবাঁকা হোয়ে যাবে এবং শাস্তি হিসাবে আল্লাহ ঐ সব মুসুল্লীদের ঘাড়, মাথা পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেবেন।

৩। আল্লাহর রসুল বোলেছেন- পিঠ এমনভাবে সোজা কোরে দাঁড়াবে যাতে সমস্ত হাড়ের গাইটগুলি (গ্রন্থী, Joint) আপন আপন জায়গায় বোসে যায় [রেফায়াহ বিন রা'ফে বিন মালেক (রা:) থেকে এমাম ইবনে হিব্বান, এমাম মাহমুদ]। রুকুতে যেয়ে দুই হাত দিয়ে হাটু এমনভাবে ধোরবে যেমন কোরে বাজপাখী শিকার ধরে এবং মাজা থেকে মাথা পর্যন্ত একদম এক লাইনে থাকবে, মাথা ঐ সরলরেখা থেকে উঁচুও হবে না, নীচুও হতে পারবে না [আবু হুমায়েদ সাঈদী (রা:) থেকে- আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাযাহ এবং আয়েশা (রা:) থেকে মোসলেম]।

৪। আল্লাহর রসুল এরশাদ কোরেছেন যে- যে ব্যক্তি রুকু হতে দাঁড়িয়ে পিঠ সোজা করে না, আল্লাহ তাঁহার সালাতের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না [আবু হোরায়রা (রা:)]। আল্লাহর রসুল শরীর, পিঠ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একদম সোজা রাখা সম্বন্ধে এতবার বোলেছেন যে তা থেকে এর গুরুত্ব বোঝা যায়। কিন্তু বর্ত্তমানের প্রচলিত সালাতে, যাকে নামায বলা হয়, এর কোন গুরুত্বই নেই। শরীর পিঠ ইত্যাদিকে রডের মত সোজা রাখার জন্য আল্লাহর রসুল যে প্রক্রিয়াটার ওপর জোর দিয়েছেন তা হোল, সমস্ত হাড়ের গ্রন্থীগুলি *(Joint)* আপন আপন জায়গায় সোজা হোয়ে বোসে যায়। কেউ যদি নিজের পিঠের, মেরুদণ্ডের জোড়া, গাইটগুলি আপন আপন জায়গায় বসিয়ে দেয় তবে অবশ্যই তার পিঠ নিজে থেকেই রডের মত সোজা হোয়ে যাবে, তেমনি তার ঘাড়ও সোজা হোয়ে যাবে এবং রুকুতে ও বসা অবস্থায় দুই হাত যখন হাটুর ওপর স্থাপন করা হবে তখন দুই বাহু একেবারে রডের মত সোজা হোয়ে যাবে। এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এই কঠিন সোজা অবস্থাই আল্লাহ ও তাঁর রসুল মুসুল্লীর সালাতে চান। শরীরের গ্রন্থী, গাইট *(Joint)* গুলিকে যথাস্থানে শক্তভাবে বসাবার ব্যাপারে এত বিভিন্ন হাদীস আছে যে সবগুলি পূর্ণভাবে উল্লেখ কোরতে গেলে এই বই অনেক বড় হোয়ে যাবে। কাজেই এখানে আমি শুধু তাদের নামগুলি এখানে উল্লেখ কোরছি। তারা হলেন- রেফায়াহ বিন রা'ফে বিন মালেক থেকে এমাম ইবনে হিকাম, এমাম মাহমুদ; আবু দাউদ, বায়হাকী; হাকীম; বোখারী; মোসলেম; আবু হোরায়রা; আলী বিন শায়বান থেকে ইবনে মাযাহ; আনাস থেকে আবু দাউদ; দারেমী, হাকিম, শাফিয়ী।

৫। আল্লাহর রসুল বোলেছেন- হে মুসুল্লীগণ শোন, যে ব্যক্তি রুকু ও সাজদাতে মেরুদণ্ড সোজা কোরবে না তাহার সালাহ্ হবে না [আলী বিন শায়বান (রা:) থেকে ইবনে মাযাহ]। সাজদা অবস্থায় পিঠের মেরুদণ্ড একদম সোজা এবং পায়ের আংগুলগুলি কেবলামুখী কোরে রাখতে হবে। রুকতে দুই হাত সোজা কোরে দুই হাঁটুর ওপর দৃঢ়ভাবে রাখতে হবে এবং পিঠ সোজা রাখতে হবে [আবু হুমায়েদ সাঈদী (রা:) থেকে- বোখারী, আবু দাউদ, তিরিমিযি, ইবনে মাযাহ]।

৬। আল্লাহর রসুল বোলেছেন- লাইন সোজা কর (ধনুকের ছিলার মত), সোজা হয়ে দাঁড়াও, **তোমাদের ঘাড়সমূহকে সোজা রাখ** [আনাস (রা:) থেকে- আবু দাউদ]।

৭। আল্লাহর রসুল বোলেছেন- লাইন সোজা কর, তোমাদের বাহুমূল (কাঁধ) সম পর্যায়ে রাখ, ফাঁকসমূহ পূর্ণ কর [ইবনে উমর (রা:) থেকে আবু দাউদ]।

এসলামের প্রকৃত সালাহ্ যে কতখানি সামরিক শৃংখলা *(Military Dicipline)* শেখায় তা ফুটে ওঠে এর নিষেধগুলির মধ্যে।

১। সাজদার স্থান থেকে ফুঁ দিয়ে ধুলাবালি সরানো বা সেখান থেকে পাথর কুচি বা কাঁকর হাত দিয়ে সরানো নিষেধ [উম্মে সালমাহ (রা:) ও আবু যর গেফারী (রা:) থেকে আহমদ তিরমিযি, আবু দাউদ নেসায়ী ও ইবনে মাযাহ্]।

২। চোখ বন্ধ কোরে রাখা, এদিক ওদিক তাকানো, কাপড় বা মাথার চুল ঠিকঠাক করা জায়েজ নয় (বোখারী)।

৩। ঐ ধনুকের ছিলার মত লাইনে দাঁড়াতে হবে একজন সৈনিকের মত শরীর, পিঠ, মেরুদণ্ড, ও ঘাড় শক্ত, সোজা কোরে। পিঠ, মেরুদণ্ড ও ঘাড় যদি সোজা, একই সরলরেখায় না থাকে তবে সালাহ্ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, নষ্ট হবে। হাই তোলা যথাসম্ভব রোধ কোরবে [আবু হোরায়রা (রা:) থেকে তিরমিযি]।

৪। চোখের দৃষ্টি নির্দিষ্ট স্থানে নিবদ্ধ রাখতে হবে, নড়াচড়া করা যাবে না। চোখ খুলে রাখতে হবে, বন্ধ করা যাবে না।

৫। সালাতের জন্য টুপী পরিধান করা বা পাগড়ী বাঁধা প্রয়োজনীয় নয় (বোখারী)।

৬। দাঁড়াবার সময় দু'পায়ে সমান ভর রাখতে হবে, কোন এক পায়ে বেশী ভর দেয়া যাবে না।

৭। সালাহ্ দ্রুত হতে হবে।

৮। আল্লাহর রসুল উচ্চস্বরে সালাতের তকবির দিতেন [আবু সাঈদ খুদরি (রা:) থেকে- বোখারী]। তিনি তকবির বলার সময় স্বর উচ্চ কোরতেন যাতে সব মোকতাদিরা শুনতে পায়- আহমদ, হাকিম ও যাহাবী।

৯। সালাতের প্রত্যেক রোকন অর্থাৎ রুকু, সাজদা, কওমা ইত্যাদি ধীরে আদায় কোরতে হবে, না হোলে সালাহ্ হবে না (বোখারী)।

এখানে বুঝতে হবে যে সালাতের রোকনগুলি ধীরে আদায় করার অর্থ কি? এ ব্যাপারে বর্ত্তমান মোসলেম বোলে পরিচিত জনসংখ্যার মধ্যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। প্রচলিত ধারণা হোচ্ছে এই যে ধীরে ধীরে নড়াচড়া, ওঠবোস কোরতে হবে। মোটেই তা নয়। যেহেতু মূলত সালাহ্ সামরিক প্রশিক্ষণ সেহেতু এর চলন *(Movement)* দ্রুত হোতে বাধ্য। হাদীসের ধীর শব্দ প্রযোজ্য হোচ্ছে ঐ দ্রুত চলনের মধ্যকার সময়ের, অর্থাৎ রুকুতে যাবার সময় দ্রুত, কিন্তু রুকুতে অর্থাৎ রুকু অবস্থায় যথেষ্ট সময়ক্ষেপণ করা। রুকু থেকে দ্রুত উঠে দাঁড়ান অবস্থায় যথেষ্ট সময় দেরী করা,

দ্রুত সাজদায় যেয়ে সাজদায় যথেষ্ট সময় দেয়া, সাজদা থেকে দ্রুত উঠে বসা অবস্থায় আবার বেশ খানিকক্ষণ সময় দিয়ে তারপর আবার সাজদায় যাওয়া, এবং দ্রুত যাওয়া, কিন্তু সাজদায় যেয়ে সাজদা অবস্থায় বেশ সময় দেয়া ইত্যাদি।

আমার কথার প্রমাণ এই সহীহ হাদীসটি- আল্লাহর রসুল যখন 'সামিআল্লাহু লেমান হামিদাহ' বোলে রুকু থেকে সোজা হোয়ে দাঁড়াতেন তখন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে আমরা মনে কোরতাম যে তিনি সাজদায় যাওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছেন এবং এক সাজদার পর বসা অবস্থায় এতক্ষণ দেরী কোরতেন যে আমরা মনে কোরতাম যে তিনি দ্বিতীয় সাজদার কথা ভুলে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি ঠিকই 'আল্লাহু আকবার' বোলে দ্বিতীয় সাজদায় যেতেন [আনাস (রা:) থেকে- বোখারী, মোসলেম, আহমদ]।

রুকু থেকে দাঁড়িয়ে এবং দুই সেজদার মাঝখানে আল্লাহর রসুলের এত দেরী করার কারণ কি? এর কারণ হোচ্ছে, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে মুসল্লী খেয়াল কোরবে যে তার দাঁড়ানো লোহার রডের মত সোজা হোয়েছে কি না, তার ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী খুঁটার মত এক স্থানে নিবদ্ধ আছে কি না, ঘাড় ও মেরুদণ্ডের গ্রন্থিসমূহ একটির উপর আরেকটি পূর্ণভাবে স্থাপিত হোয়েছে কি না, দুই পায়ের উপর সমান ভার রোয়েছে কি না, চোখ খোলা এবং দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত আছে কি না, হাত শক্তভাবে সোজা আছে কি না। এইগুলি লক্ষ্য কোরতে এবং সব ঠিক আছে নিশ্চিত হোতে যতটা সময় লাগে ততটা সময় দাঁড়িয়ে থাকার পর মুসল্লি দ্রুতগতিতে সেজদায় যাবে। সেজদায় গিয়ে আবার সে লক্ষ্য কোরবে তার মেরুদণ্ড সোজা হোয়েছে কি না, দুই হাত দুই কাঁধের নিচে সঠিকভাবে রাখা হোয়েছে কি না, হাতদুটি সমান্তরাল রোয়েছে কি না, হাঁটু এবং কোনুইয়ের মাঝে পেটের নিচ দিয়ে একটি ছাগশিশু এদিক থেকে ওদিকে যাওয়ার মতো ফাঁক রোয়েছে কি না, হাটুদ্বয় সমান্তরালভাবে পতিত হোয়েছে কি না, নাক এবং কপাল সমভাবে সাজদার স্থানে রাখা হোয়েছে কি না, সমস্ত দেহের ভার দুই হাঁটু, দুই পা, দুই হাত, নাক ও কপাল এর উপর সমভাবে পতিত হোয়েছে কি না, চোখ খোলা রোয়েছে কি না, দুই পা খাঁড়াভাবে এবং সমান্তরালভাবে রাখা হোয়েছে কি না, হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলি কেবলামুখী রোয়েছে কি না এবং দুই কোনুই দেহ থেকে সামান্য ফাঁক রোয়েছে কি না। সবগুলি বিষয় লক্ষ্য করার পর সব ঠিক আছে নিশ্চিত হোয়ে সে দ্রুতগতিতে সেজদাহ থেকে উঠে বোসবে। বসার পর সে লক্ষ্য কোরে দেখবে তার বসা সঠিক হোয়েছে কি না, মেরুদণ্ড রডের মত সোজা হোয়েছে কি না, ঘাড় মাথা মেরুদণ্ডের সাথে একই লাইনে সোজা হোয়েছে কি না, হাত শক্তভাবে সম্পূর্ণ প্রসারিত হোয়েছে কি না, বসা নিয়ম মোতাবেক বাঁ পায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে কি না, ডান পায়ের পাতা সঠিকভাবে খাঁড়া হোয়েছে কি না এবং আঙ্গুলগুলি কেবলামুখী হোয়েছে কি না, দুই উরু সমান্তরালভাবে পতিত হোয়েছে কি না, দুই হাত হাঁটুর উপর ঠিকভাবে নিবদ্ধ হোয়েছে কি না, চক্ষু খোলা কি না, দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত এবং এক স্থানে নিবদ্ধ কি না অর্থাৎ এক কথায় বসা অবস্থায় যে সমস্ত নিয়ম কানুন আছে তার প্রত্যেকটি যথাযথভাবে পালন করা হোয়েছে কি না। এ

বিষয়গুলি খেয়াল কোরতে এবং সবকিছু সঠিক হোয়েছে কি না নিশ্চিত হোতে যে সময় লাগবে সে সময়টুকু মুসল্লী বসা অবস্থায় থাকবে। তারপর সে দ্রুতগতিতে দ্বিতীয় সেজদায় যাবে। প্রথম সেদজার নিয়মে দ্বিতীয় সেজদা শেষ কোরে সে আবার দ্রুতগুতিতে উঠে দাঁড়াবে। বর্ত্তমানে বিকৃত এসলামে যে সালাহ্ পড়া হয় লক্ষ্য কোরলে দেখা যাবে যে তা এসলামের প্রকৃত সালাহর ঠিক বিপরীত। বর্ত্তমানের মুসল্লীরা অতি ধীর গতিতে রুকু এবং সেজদায় যান, রুকু থেকে সোজা হোয়ে দাঁড়াবার পর সেজদায় যাওয়ার আগে এবং প্রথম সেজদা থেকে উঠে বসার পর দ্বিতীয় সেজদায় যাওয়ার আগে তারা কোন সময় দেন না। অর্থাৎ বিশ্বনবীর শেখানো ও তাঁর নিজের কায়েম করা সালাতের ঠিক বিপরীত।

এসলামের প্রকৃত সালাহর নিয়ম হোচ্ছে, এমামের তকবিরের জন্য সতর্ক, তৎপর হোয়ে থাকা ও তকবিরের সঙ্গে সঙ্গে জামাতের সকলের সঙ্গে একত্রিতভাবে, একসাথে রুকুতে যাওয়া, এ'তেদাল করা, সাজদায় যাওয়া, সালাম ফেরানো ইত্যাদি করা; ঠিক যেমন ভাবে প্যারেড, কুচকাওয়াজের সময় সামরিক বাহিনীর সৈনিকেরা সার্জেন্ট মেজরের *(Sergeant-major)* আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সকলে একত্রিত ভাবে মার্চ করে, ডাইনে বামে ঘুরে, দাঁড়ায়, বসে, দৌঁড়ায়। সঠিক, পূর্ণভাবে সালাহ্ কায়েম কোরতে গেলে ১০০ টিরও বেশী ছোট বড় নিয়ম পদ্ধতি পালন কোরতে হয়। সবগুলো না কোরলেও অন্তত চৌদ্দটি ফরদ, চৌদ্দটি ওয়াজেব, সাতাশটি সুন্নত আর বারটি মোস্তাহাব খেয়াল রেখে, সেগুলি সঠিক ও পূর্ণ ভাবে পালন কোরে সালাহ্ কায়েম কোরতে গেলে বর্ত্তমানে সালাতে যে ধ্যানের কথা বলা হয় তা কতখানি সম্ভব? এদিকে আল্লাহর রসুল বোলেছেন যে- তোমরা পূর্ণভাবে সালাহ্ কায়েম কর, কারণ আল্লাহ পূর্ণ ব্যতিত সালাহ্ কবুল করেন না- [আবু হোরায়রা (রা:)]।

সাধারণ জ্ঞানেই *(Commom sense)* বোঝা যায় যে, সালাতের এতগুলি নিয়ম কানুন পালন কোরে যে ধ্যান বর্ত্তমানের এসলাম দাবী করে তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার এ কথায় যিনি একমত হবেন না তিনি মেহেরবানী কোরে ঐ নিবিষ্টতা অর্থাৎ ধ্যান নিয়ে চার রাকাত সালাহ্ পড়তে চেষ্টা কোরে দেখতে পারেন- দেখবেন সালাতে ভুল হোয়ে যাবে।

তবে মনে রাখতে হবে, সালাহ শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় দিকের সংমিশ্রণ। সালাতে এই বাহ্যিক নিয়মকানুনগুলি যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন কোরতে হবে, তেমনি একই সাথে তার মনের অবস্থা হবে বিনয়াবনত। সে মনে কোরবে যে সে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছে এবং আল্লাহর জন্য তার হৃদয় বিগলিত থাকবে।

ওজু কোরে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হবার পর সালাতের প্রথম কাজ হোল কাবার দিকে মুখ কোরে দাঁড়ানো। কেন? **আল্লাহকে স্মরণ (যেক্‌র) কোরতে কাবার দিকে মুখ কোরে দাঁড়াতে হবে কেন? কাবা আল্লাহর ঘর বোলে?** আল্লাহতো সর্বত্র আছেন, আমাদের প্রত্যেকের ঘাড়ের রগের চেয়েও যিনি নিকটে আছেন (কোর'আন- সুরা কাফ ১৬) তাঁকে স্মরণ করার জন্য হাজার হাজার মাইল দূরে তাঁর ঘরের দিকে মুখ করার প্রয়োজন কি? উদ্দেশ্য হোচ্ছে ঐক্য; মতের ঐক্য, উদ্দেশ্যের

ঐক্য, লক্ষ্যের ঐক্য, আকীদার ঐক্য। একদল লোক যদি একত্র হোয়ে কোন নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানের দিকে রওনা হয়, তবে যতক্ষণ তাদের ঐ গন্তব্যস্থানের কথা মনে থাকবে ততক্ষণ তারা একত্রিত থাকবে, একত্রিতভাবেই পথ চোলতে থাকবে, কোন বাধা আসলে একত্রিত হোয়েই তা প্রতিহত কোরবে, একত্রিত হোয়েই বাধা অপসারণ কোরবে। কিন্তু মধ্য পথে যদি তারা হঠাৎ সবাই গন্তব্যস্থানের কথা ভুলে যায় তবে অবশ্যম্ভাবীরূপে তারা আর ঐক্যবদ্ধ, একত্রিত থাকবে না, এক এক জন এক এক দিকে ছড়িয়ে যাবে, দল আর দল থাকবে না।

আল্লাহ-রসুলের দেয়া উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, আকীদা ভুলে যাবার ফলে সালাহ্-কে অন্যান্য ধর্মের মত উপাসনায় পরিণত করার ফলে এই উম্মাহ আজ আর ঐক্যবদ্ধ নেই, হাজার ভাগে বিভক্ত। আজ এই উম্মাহ শুধু শারীরিকভাবে একই দিকে, কাবার দিকে মুখ কোরে দাঁড়ায়; মানসিকভাবে বিভিন্ন মযহাবে, ফেরকায়; আত্মিকভাবে বিভিন্ন তরিকায়; রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন ভৌগলিক রাষ্ট্রে ও রাজনৈতিক দলে বিভক্ত। সালাতের ঐ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আকীদার ঐক্য হারিয়ে যাবার ফলে এই জাতি আজ শক্তিহীন, কাজেই অন্য জাতি দ্বারা পরাজিত লান্ছিত, অপমানিত। আল্লাহ বোলেছেন- তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হোয়ো না (সুরা আল-এমরান ১০৩)।

কাবার দিকে মুখ করার পর দ্বিতীয় কাজ হোল লাইন কোরে দাঁড়ানো। শুধু কাবার দিকে মুখ করা নয়, লাইন কোরে দাঁড়ানো। কেন? আল্লাহকে স্মরণ কোরতে, তাঁর যেক্র কোরতে, ধ্যান কোরতে, লাইন কোরতে হবে কেন? তাঁর যেক্র করার সাথে লাইন করার কী সম্পর্ক? একই দিকে মুখ কোরে ধনুকের ছিলার মত সোজা লাইন কোরে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য ঐক্য ও শৃংখলার প্রশিক্ষণ।

সালাতে তারপরের কাজ এমামের (নেতার) তকবিরের (আদেশের) সঙ্গে সঙ্গে আমল (কাজ) করা; সকলে একত্রে, একই সাথে রুকুতে যাওয়া, এমামের আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সোজা হোয়ে দাঁড়ানো, সাজদায় যাওয়া, সালাম করা ইত্যাদি। এ হোল আনুগত্য ও আদেশ পালন করার প্রশিক্ষণ এবং এই আনুগত্য ও আদেশ পালন সকলে একত্রে, ঐক্যবদ্ধভাবে। কেউ যদি এমামের আনুগত্য কোরেও রুকু, সাজদা ইত্যাদি করে কিন্তু সকলের সঙ্গে একসঙ্গে না কোরে আগে বা নিজের ইচ্ছামত বেশী পরে করে তবে তার সালাহ্ হবে না। এমাম যদি রুকু বা সাজদায় যেয়ে একঘণ্টা থাকেন তবে প্রত্যেক মোকতাদীকে তাই থাকতে হবে, নইলে তার সালাহ্ হবে না। এটা কী শেখায়? এটা কি ধ্যান করা শেখায়? অবশ্যই নয়; এটা শেখায় শর্ত্তহীন আনুগত্য, আদেশ পালন। রুকু, সেজদা করায় এমাম যদি আদেশের ধারাবাহিকতায় একটু ভুল করে তাহোলে মুসুল্লীরা আল্লাহু আকবার বলে লোক্মা দিয়ে এমামকে বুঝিয়ে দেন, এমাম সাথে সাথে সাজদায়ে সহু করে আবার আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেন।

আল্লাহ সালাহ্-কে ফরদে আইন কোরে দিয়েছেন। যদিও সালাতের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য হোচ্ছে সামরিক, যুদ্ধের প্রশিক্ষণ কিন্তু এতেই সালাহ্ সীমিত নয়। পেছনে বোলে এসেছি সালাতের মধ্যে শারীরিক, চারিত্রিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা আল্লাহ রেখে দিয়েছেন।

সালাতের সারিতে দাঁড়ানো বিশালদেহী শক্তিশালী লোকটি তার পাশে দাঁড়ানো ছোট, দুর্বল লোকটির প্রতি কোন অবজ্ঞার ভাব রাখতে পারবে না, কারণ দু'জনেই দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে যিনি দু'জনেরই স্রষ্টা, দু'জনেরই প্রভু। তাকে ভাবতে হবে, কে জানে হয়ত এই ছোট দুর্বল লোকটিই আল্লাহর কাছে আমার চেয়ে প্রিয়। অনুরূপভাবে মহাপণ্ডিত, আলেমের পাশে দাঁড়ানো নিরক্ষর লোকটি, কোটিপতির পাশে দাঁড়ানো দরিদ্র লোকটি, অতি সুন্দর লোকটির পাশে দাঁড়ানো বিশ্রী লোকটি, সবাই তাদের প্রভুর সামনে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়ানো, সবাই তাঁর কাছে সমান, সবাই তাঁরই উপাসক। কেউ জানে না এদের মধ্যে কার সালাহ্ আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়, গ্রহণযোগ্য। সালাহ্ এই মনোভাব মুসুল্লীদের মধ্যে তৈরী করে। যদি মুসুল্লীদের মধ্যে এই মনোভাব প্রতিষ্ঠিত, কায়েম না হয় তাদের সালাহ্ ক্ষতিগ্রস্ত, তারা সালাতের পূর্ণ প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত।

একটি বিশিষ্ট চরিত্রের বহু মানুষ তৈরী করার জন্য সালাহ্ একটি ছাঁচ্ *(Mould)*। এই ছাঁচে ফেলে যে চরিত্র সৃষ্টি হবে তা হবে দৃঢ়, সুশৃংখল, নেতার আদেশে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধাহীন, সংকল্পের কঠিনতায় তারা ইস্পাতের চেয়েও শান্ দেওয়া মরণজয়ী যোদ্ধা আর সেই সঙ্গে কোমলতায়, ব্যবহারে মাধুর্য্যে ভরপুর। এই কথাটাই আল্লাহ বোলছেন সুরা ফাতাহ্র শেষ আয়াতে। বোলছেন- মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল; যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফেরদের (শত্রুর) প্রতি কঠোর, কঠিন আর নিজেদের মধ্যে তারা দয়ামায়া, সহমর্মিতায় পূর্ণ। **তাদের দেখবে তারা রুকু কোরছে, সাজদা কোরছে** (সালাহ্ কায়েম কোরছে)। অর্থাৎ আল্লাহ বোলছেন সঠিক ও পূর্ণভাবে যারা সালাহ্ কায়েম কোরবে তারা হবে শত্রুর (কাফের, মোশরেক) জন্য দুর্ধর্ষ, ভয়ংকর যোদ্ধা আর নিজেদের মধ্যে মায়াময়, সহমর্মী, ভাই বন্ধু। বর্ত্তমানে যে পৃথিবীময় সালাহ্ পড়া হয় এই সালাহ্ কি এ চরিত্রের মানুষ তৈরী কোরছে? অবশ্যই নয়; বরং ঠিক উল্টোটাই কোরছে। বর্ত্তমানের সালাহ্ যে চরিত্রের জাতি সৃষ্টি কোরছে তা শত্রু দেখে ভীত, শত্রুর কাছে পরাজিত, লান্ছিত, শত্রুর অবজ্ঞার পাত্র, আর নিজেদের মধ্যে হিংসা, ঈর্ষা, অনৈক্য আর বিভেদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত। শুধু তাই নয় তারা নিজের জাতির চেয়ে শত্রুর প্রতি বেশী অনুগত, বেশী হীনমন্যতায় পূর্ণ।

শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক উন্নতির ব্যবস্থা থাকলেও সালাতের মুখ্য ও মূল উদ্দেশ্য হোচ্ছে সুশৃংখল, নেতার আদেশ পালনে আগুনে ঝাঁপ দিতে তৈরী দুর্ধর্ষ, অপরাজেয় যোদ্ধার চরিত্র সৃষ্টি। আমার এই বক্তব্যের প্রমাণ আল্লাহর রসুলের কয়েকটি হাদীস। তিনি বোলেছেন- এসলাম একটি ঘর। এই ঘরের থাম, খুঁটি, স্তম্ভ হোচ্ছে সালাহ্; আর ছাদ হোচ্ছে জেহাদ [হাদীস- মুয়ায (রা:) থেকে আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, মেশকাত] মনে রাখতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কথা আমাদের কথার মত নয়। তাঁদের প্রতিটি কথা, প্রতিটি শব্দ ভেবে, ওজন কোরে বলা। আল্লাহর রসুল এসলামকে বেশ কয়েকটি হাদীসেই ঘরের সঙ্গে তুলনা কোরেছেন প্রকৃত এসলাম কি তা উদাহরণ দিয়ে আমাদের বোঝাবার জন্য। ঘর মানুষ তৈরী করে কেন? অবশ্যই সেখানে থাকার জন্য, রোদ, বৃষ্টি থেকে বেঁচে ঘরের ভেতরে বসবাস করার জন্য, তাই নয় কি? রোদ-বৃষ্টি থেকে আমাদের বাঁচায় কিসে? ঘরের ভিত্তি? নাকি ঘরের থাম, খুঁটি? নাকি ছাদ? অবশ্যই ঘরের

ছাদ। অর্থাৎ ঘর তৈরীর আসল উদ্দেশ্যই হোচ্ছে ছাদ তৈরী। কিন্তু থাম, খুঁটি, স্তম্ভ ছাড়া ছাদকে ওপরে ধোরে রাখা যাবে না আর ঘরের ভিত্তি যদি শক্ত তওহীদের ওপর না হয় তবে তা ধ্বসে পোড়বে। কাজেই ঐ খাম, খুঁটির প্রয়োজন। ঘরের খাম, খুঁটি তৈরী কোরেও যদি ওপরে ছাদ তৈরী না করা হয় তবে সেই ঘরে বসবাস করা যাবে না। হীরা-মতি বসানো, সোনা-রূপার তৈরী খাম-খুঁটি অর্থহীন হোয়ে যাবে, আজ যেমন হোচ্ছে পৃথিবীময়। আজ থাম-খুঁটি তৈরীকেই যথেষ্ট মনে কোরে সালাহ্-ই পড়া হোচ্ছে আপ্রাণ চেষ্টা কোরে; ওপরে ছাদ তৈরী করার কথা তেরশ' বছর আগেই ভুলে যাওয়া হোয়েছে। আজকের এই বিকৃত এসলামের ঘরের বহু থাম, খুঁটি স্তম্ভ আছে, ছাদ নেই; ছাদ নেই বোলেই খ্রীস্টান, ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধের হাতে পরাজয়, লান্ছনা, অপমানরূপে ঝড়, বৃষ্টি, প্রখর রোদ ঐ ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে একে বসবাসের একেবারে অযোগ্য কোরে ফেলেছে। কিন্তু একশ' পঞ্চাশ কোটির এই জাতির সে বোধ নেই। তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে কোটি কোটি বাকা-টেরা থাম-খুঁটি আর লক্ষ লক্ষ মসজিদ তৈরী কোরে চোলেছে।

আল্লাহর রসুলের ঐ হাদীসগুলি থেকে একথা পরিষ্কার যে সালাতের (থাম, খুঁটি, স্তম্ভের) উদ্দেশ্য হোল ছাদকে ওপরে ধোরে রাখা, জেহাদকে কার্যকরী করা। অর্থাৎ জেহাদ, যুদ্ধ কোরে জয়ী হওয়ার জন্য যে চরিত্র প্রয়োজন সেই চরিত্র সৃষ্টি করা; জেহাদের প্রশিক্ষণ। **কাজেই জেহাদ, প্রচেষ্টা, সংগ্রাম যদি বাদ দেয়া হয় তবে সালাহ্ অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়;** যেমন যে কোন সামরিক বাহিনী যদি যুদ্ধ করা ছেড়ে দেয় তবে তাদের প্যারেড, কুচকাওয়াজ করা যেমন অর্থহীন, যেমন ছাদ তৈরী করা না হোলে থাম, খুঁটি অর্থহীন।

এসলামকে একটি ঘরের সঙ্গে তুলনা কোরলে বোলতে হয় এসলাম নামক ঘরের ভিত্তি *(Foundation)* হোল আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদ; খাম-খুঁটি *(Pillar)* হোল সালাহ্, আর ছাদ *(Roof)* হোল জেহাদ। থাম-খুঁটির *(Pillar)* চেয়ে ছাদ *(Roof)* যে বেশী প্রয়োজনীয় তা আল্লাহর নবী বোলে গেছেন পরিষ্কার কোরে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হোল -দীনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি? তিনি জবাব দিলেন- আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর ঈমান; অর্থাৎ তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। আবার জিজ্ঞাসা করা হোল- তারপর কি? তিনি উত্তর দিলেন- আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ [হাদীস- আবু হোরায়রা (রা:) থেকে মোসলেম, বোখারী]। এসলামের ঘরের ভিত্তি যে আল্লাহর তওহীদ তা তিনি আগের হাদীসগুলিতে বলেন নি কারণ তওহীদই যে দীনের ভিত্তি তা এত প্রকট যে তা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কোর'আনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ একথা বহুবার বোলেছেন। তবু দীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি অর্থাৎ ভিত্তি কি প্রশ্নের জবাবে তিনি বোললেন- তওহীদ। তাহোলে দাঁড়ালো এই যে দীনুল এসলামের ঘরের ভিত্তি আল্লাহর তওহীদ, এর থাম-খুঁটি সালাহ্ আর এর ছাদ হোল আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ (ঐ তওহীদ এবং তওহীদ ভিত্তিক দীন সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য)।

আল্লাহ এসলামের যে ঘরটি চৌদ্দশ' বছর আগে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তার ভিত্তি আল্লাহর তওহীদ আজ নেই। **আল্লাহর তওহীদ হোল তাঁর সার্বভৌমত্ব;** অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র,

গোষ্ঠী, জাতি, রাষ্ট্র, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প ইত্যাদি সর্ববিষয়ে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ছাড়া আর কাউকে গ্রহণ না করা; এক কথায় যে কোন বিষয়ে, যেখানে আল্লাহর ও তাঁর রসুলের (কারণ রসুল আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোন কথা বলেন নাই- সুরা নজম ৩-৪) কোন বক্তব্য আছে, নির্দেশ আছে সেখানে পৃথিবীর আর কাউকে স্বীকার না করা। এই তওহীদ আজ পৃথিবীর কোথাও নেই। মোসলেম দুনিয়া বোলে, মোসলেম রাষ্ট্র বোলে পরিচিত কোনও রাষ্ট্রেও নেই; অথচ এর নিচে কোন তওহীদও নেই, যে তওহীদ মহান আল্লাহ গ্রহণ কোরবেন। এর নিচে যা আছে, অর্থাৎ আজ মোসলেম দুনিয়ায় যা চোলছে তা শেরক ও কুফর। তারপর সেই ঘরের ছাদ জেহাদও নেই। তাহোলে রোইল কি? রোইল ঘরটার শুধু খাম-খুঁটি এবং সমস্ত জাতি বিকৃত আকীদায় ঐ খাম-খুঁটিকে অর্থাৎ সালাহ্-কে আঁকড়িয়ে ধোরে আছে। যেহেতু তওহীদের দৃঢ় ভিত্তি নেই সেহেতু ঐ খাম-খুটিগুলিও আর খাম-খুটি, স্তম্ভ নেই; ওগুলো ভঙ্গুর, ঠুনকো ও মৃদু আঘাতেই ওগুলো ধ্বসে পড়ে যায়, ওগুলো আর যোদ্ধার চরিত্র সৃষ্টি কোরতে পারে না।

এই দীনের নেতারা, ওলামা, আল্লামা, ফুকাহা, মোহাদ্দেসিন, মুফাস্সেরিন এরা সবাই একমত যে **আকীদা সহীহ অর্থাৎ সঠিক না হোলে ঈমানেরও কোন দাম নেই এবং স্বভাবত ঈমান ভিত্তিক সব আমল অর্থাৎ সালাহ্ (নামায), যাকাহ, হজ্ব, সওম (রোযা) এবং অন্যান্য কোন এবাদতেরই আর দাম নেই, সব অর্থহীন।** তাদের এই অভিমতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু বর্ত্তমানের এই বিকৃত এসলামে আকীদার অর্থ করা হয় ঈমান। এটা ভুল। আকীদার প্রকৃত অর্থ হোল কোন বিষয় সম্বন্ধে সঠিক ধারণা। কোন জিনিস দিয়ে কী হয়, ওটার উদ্দেশ্য কি, ওটাকে কেন তৈরী করা হোয়েছে তা সঠিক ভাবে বোঝা (এ সম্বন্ধে আমার লেখা এসলামের প্রকৃত আকীদা বইটি দেখুন)। সালাহ্ সম্বন্ধে সঠিক আকীদা কি? সঠিক আকীদা পেছনে বোলে এসেছি, এখানে আবার পেশ কোরতে চাই। অত্যন্ত সংক্ষেপে সঠিক আকীদা হোল:

আল্লাহ তাঁর শেষ রসুলকে পাঠালেন এই দায়িত্ব দিয়ে যে তিনি যেন আল্লাহর দেয়া হেদায়াহ ও সত্যদীন পৃথিবীর অন্য সব দীনের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন, এবং নিজে এই কথার সাক্ষী রোইলেন (কোর'আন- সুরা ফাতাহ ২৮)। এই হেদায়াতই হোল তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, সেরাতুল মোস্তাকীম; এবং সত্যদীন হোল ঐ তওহীদের ওপর ভিত্তি করা জীবন-ব্যবস্থা, শরিয়াহ, দীনুল এসলাম, দীনুল কাইয়্যেমাহ। এই কাজের অর্থাৎ এই সত্যদীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার তরিকা, প্রক্রিয়া অর্থাৎ কোন্ নীতিতে এই কাজ করা হবে তাও আল্লাহ নির্দ্ধারিত কোরে দিলেন এবং সেটা হোল কেতাল, সশস্ত্র সংগ্রাম, যুদ্ধ। প্রশিক্ষণ ছাড়া, চরিত্র গঠন ছাড়া যুদ্ধ কোরে জয়লাভ সম্ভব নয়, খাম-খুঁটি, পিলার ছাড়া ছাদ রাখা সম্ভব নয়, কাজেই সেই চরিত্র গঠন ও প্রশিক্ষণের জন্য নির্দ্ধারিত কোরে দিলেন সালাহ্ এবং এই সালাহ্-কেও ফরদে আইন অবশ্য কর্ত্তব্য, *(Must)* কোরে দিলেন (সুরা বনি এসরাঈল ৭৮)।

আজ মোসলেম দুনিয়ায় সালাতের সম্বন্ধে আকীদা কি? সালাহ্ চরিত্র গঠনের মুখ্যত দুর্ধর্ষ, অপরাজেয় যোদ্ধার চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া; এই আকীদা বদলে একে অন্যান্য ধর্মের মত এবাদতের, উপাসনার শুধু আত্মিক উন্নতির প্রক্রিয়া বোলে মনে করার ফলে আজ সেই যোদ্ধার চরিত্র গঠন তো হয়ই না এমন কি সালাতের বাহ্যিক চেহারা পর্যন্ত বদলে গেছে। আল্লাহর রসুলের বহুবারের দেওয়া তাগীদ- সাবধান বাণী- তোমাদের সালাতের লাইন ধনুকের ছিলার মত সোজা কর, নাহোলে আল্লাহ তোমাদের মুখ পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেবেন, তাঁর আদেশ- তোমাদের মেরুদণ্ড, ঘাড় সোজা কোরে সালাতে দাঁড়াও এ সমস্ত কিছুই আজ ভুলে যাওয়া হোয়েছে। এসব হুকুম না মুসুল্লীদের মনে আছে, না এমামদের মনে আছে। কাজেই ঐ সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণের সালাহ্ আজ নুব্জ, বাকা লাইনের; বাঁকা পিঠের মুসুল্লী ও এমামদের মরা সালাহ্। আল্লাহ কোর'আনে সুরা নেসার ১৪১-১৪২ নং আয়াতে মোনাফেকদের সালাতের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন- মোনাফেকরা শৈথিল্যের সাথে সালাতে দাঁড়ায়। আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন 'কুসালা' যার অর্থ সাহস হারিয়ে ফেলা, অলসতা, ঢিলা-ঢালা ভাবে। বর্ত্তমান বিশ্বের মোসলেম নামের এ জাতির সালাতের দিকে তাকালে কুসালা শব্দের অর্থ বুঝতে কারও কষ্ট হবে না। খুশু, খুজুর নামে এ জাতি 'কুসালা' শব্দের যথাযথ প্রয়োগ কোরছে। সমস্ত বিশ্বে বর্ত্তমানে এই সাহসহীন সালাহ্-ই চলছে। এই মরা প্রাণহীন সালাতের পক্ষে বলা হয়- খুশু-খুজুর সাথে নামায পড়া উচিত। এই খুশু-খুজু কী? বর্ত্তমানে বলা হয় সমস্ত কিছু থেকে মন সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন কোরে আল্লাহর প্রতি মন নিবিষ্ট করা হোচ্ছে খুশু-খুজু; অর্থাৎ এক কথায় ধ্যান করা।

প্রশ্ন হোচ্ছে, সালাতে আল্লাহকে ধ্যান করাই যদি উদ্দেশ্য হোয়ে থাকে তবে আল্লাহ সালাতের প্রক্রিয়া, নিয়ম-কানুন এমন কোরে দিলেন কেন যাতে **ধ্যান করা অসম্ভব।** খুশু-খুজু অর্থাৎ ধ্যান করাই আল্লাহর উদ্দেশ্য হোলে সালাতের নিয়ম হতো পাহাড়-পর্বতের গুহায়, কিম্বা খানকা বা হুজরায় অথবা অন্ততপক্ষে কোন নির্জন স্থানে ধীর-স্থিরভাবে একাকি বোসে চোখ বন্ধ কোরে মন নিবিষ্ট কোরে আল্লাহর ধ্যান করা। সালাহ্ কি তাই? অবশ্যই নয়, সালাহ্ এর ঠিক উলটো। বহু জনসমাবেশের মধ্যে যেয়ে সেখানে ধনুকের ছিলার মত সোজা লাইন কোরে দাঁড়িয়ে সৈনিকের, যোদ্ধার মত ঘাড়, মেরুদণ্ড লোহার রডের মত সোজা কোরে, এমামের তকবিরের (আদেশের) অপেক্ষায় সতর্ক, তটস্থ, থাকা তারপর তকবিরের সঙ্গে সঙ্গে সকলে একত্রে রুকু, সাজদায় যাওয়া, ওঠা, সালাম দেয়া অর্থাৎ এমামের (নেতার) আদেশ পালন করা। সালাতের প্রায় ১১৪ টি নিয়ম-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রেখে, সেগুলি যথাযথভাবে পালন কোরে ঐ খুশু-খুজুর **সাথে অর্থাৎ ধ্যানের সাথে সালাহ্ সম্পাদন করা যে অসম্ভব** তা সাধারণ জ্ঞানেই *(Common sense)* বোঝা যায়। অথচ ঐ নিয়ম-পদ্ধতি সঠিক ভাবে, যথাযথ ভাবে পালন না কোরে যেমন-তেমন ভাবে সালাহ্ পড়লে তা আল্লাহ গ্রহণ কোরবেন না। আল্লাহর রসুল বোলেছেন- তোমরা পূর্ণভাবে সালাহ্ কায়েম করো, কেননা আল্লাহ পূর্ণ ব্যতিত সালাহ্ কবুল করেন না [আবু হোরায়রা (রা:) থেকে]। তিনি আরও বোলেছেন- তোমাদের কাহারও সালাহ্ পূর্ণ (সঠিক) হবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা

আল্লাহ যেভাবে আদেশ কোরেছেন ঠিক সেইভাবে কায়েম কোরবে (আবু দাউদ)। আল্লাহ-রসুলের আদেশ মোতাবেক সমস্ত নিয়ম-কানুন যথাযথ পালন কোরে অর্থাৎ পূর্ণ সঠিকভাবে সালাহ্ কায়েম কোরলে ঐ খুশু-খুজু, অর্থাৎ বর্ত্তমানে মুসুল্লীরা খুশু-খুজু বোলতে যা বুঝেন তা অসম্ভব। খুশু-খুজুর প্রকৃত উদ্দেশ্য হোচ্ছে- মো'মেন যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন তার মন পৃথিবীর সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে একাগ্র হবে সালাতে; সে সমস্ত ক্ষণ সচেতন থাকবে যে সে মহামহীম আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আল্লাহর বিরাটত্ব ও তার নিজের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে সে থাকবে সর্বদা সচেতন, আর সেই সঙ্গে একাগ্র হোয়ে থাকবে এমামের (নেতার) তকবিরের (আদেশের) প্রতি, সালাহ্ সঠিকভাবে, নিখুঁতভাবে সম্পাদন কোরতে। এই হোল খুশু-খুজু।

কিন্তু এই খুশু-খুজু অর্থাৎ একাগ্রতার মানে এই নয় যে সালাতে দাঁড়াবে নুব্জ, সম্মুখে ঝুকে, মাথা নত কোরে। কারণ যিনি আমাদের সালাহ্ শিখিয়েছেন আল্লাহর রসুল তিনি আদেশ কোরেছেন- সালাতে দাঁড়াবে সোজা হোয়ে, মেরুদণ্ড, ঘাড় সোজা শক্ত কোরে (সৈনিকের মত)। আল্লাহ কোর'আনে বোলছেন- সালাহ্ কায়েম কর আনুগত্যের সাথে (কোরান- সুরা বাকারা ২৩৮), আল্লাহ আবার বোলছেন সালাহ্ কায়েম কর বিনয়ের সাথে (কোরান- সুরা মু'মিনুন ২)। তাঁর রসুল বোলছেন- সোজা, শক্ত, দৃঢ় ভাবে সালাতে দাঁড়াও। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না কি যে দু'টি আদেশ বিপরীতমুখী? না, মোটেই বিপরীতমুখী নয়; আল্লাহর ও তাঁর রসুলের কথা বিপরীত হোতে পারে না। একটা মানসিক আর অন্যটা **দৈহিক। সালাতে মন থাকবে বিনয়ী, নম্র, অনুগত আর দেহ থাকবে লোহার রডের মত দৃঢ়, ঋজু; রুকুতে সাজদায় যেয়েও পিঠ ঘাড় হাত, পা থাকবে সোজা, শক্ত; বিচলন, গতি হবে দ্রুত। এই দুই মিলিয়ে হবে এসলামের প্রকৃত সালাহ্।** মো'মেন যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন তার মনের অবস্থা হবে এই রকম যে সে সর্বক্ষণ সচেতন থাকবে যে সে এই বিশাল বিরাট সৃষ্টির স্রষ্টার রাব্বুল আলামিনের সামনে দাঁড়িয়েছে। কেন দাঁড়িয়েছে? দাঁড়িয়েছে এই জন্য যে সে ঐ মহান স্রষ্টার খলিফা, প্রতিনিধি, এবং খলিফা হিসাবে তার সর্বপ্রধান দায়িত্ব হোচ্ছে সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর তওহীদ ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থা কার্যকরী কোরে সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার-অবিচার, অশান্তি আর রক্তপাত দূর কোরে শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠা করা। ঐ বিশাল দায়িত্ব পূর্ণ কোরতে গেলে যে চরিত্র প্রয়োজন, যে চরিত্রে সংকল্পের দৃঢ়তা, ঐক্য, শৃংখলা, আনুগত্যের ও হেজরতের সমাহার সেই চরিত্র সৃষ্টির জন্য সে সালাতে দাঁড়িয়েছে। মনের ভেতরে তার থাকবে বিনয়, সসম্মান-ভক্তি (যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে, সুরা মো'মেনুন- ২) আর শারীরিক ভাবে সে দাঁড়াবে আল্লাহর মোজাহেদ (যোদ্ধা), সৈনিকের মত দৃঢ়, লোহার রডের মত সোজা হোয়ে, তটস্থ হোয়ে থাকবে এমামের আদেশের (তকবিরের) অপেক্ষায় এবং আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সকলে একত্রে হোয়ে একসঙ্গে দ্রুত সে আদেশ পালন কোরবে (কানেতিন- অনুগত, সুরা বাকারা ২৩৮)। এই হোচ্ছে এসলামের প্রকৃত সালাহ্। এসলামের সালাহ্ যে অন্যান্য ধর্মের ধ্যান নয় তার প্রমাণ সালাতের পুরো প্রক্রিয়াটাই। তার মধ্যে বিশেষ কোরে এই নিয়মটি যে সালাতে চোখ বন্ধ করা যাবে না। ধ্যান করতে গেলে তো

বটেই, এমন কি কোন বিষয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা কোরতে গেলেও মানুষের চোখ বন্ধ হোয়ে আসে। সেই চোখ বন্ধ করাকে নিষিদ্ধ করার মানে এই নয় কি যে **সালাতে ধ্যান করার যায়গা নেই, আছে সজাগতা, অতন্দ্র সতর্কতা?**

সালাহ্ শুধু যে ধ্যান নয়, প্রকৃতপক্ষে ধ্যানের ঠিক বিপরীত তার পক্ষে কয়েকটি কারণ পেশ কোরছি। ১) সালাহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ হোচ্ছে কোন বাঁকা-টেরা পদার্থ, জিনিসকে আগুনে পুড়িয়ে, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে কোন কাজের জিনিস তৈরী করা; আর ধ্যান হোচ্ছে নিষ্ক্রিয় হোয়ে গভীর চিন্তা করা। ২) সালাহ্ গতিশীল *(Dynamic);* ধ্যান স্থিতিশীল, স্থবির *(Static)*। ৩) তাকবিরের *(Command)* আনুগত্য কোরতে হয়; ধ্যানে *Command* এর কোন স্থানই নেই। ৪) দলবদ্ধভাবে কায়েম কোরতে হয়; ধ্যান একা একা কোরতে হয়। ৫) সালাতে চুড়ান্ত সচেতন ও সতর্ক অবস্থায় থাকতে *(Alert)* হয়; ধ্যানে ঠিক বিপরীত অর্থাৎ নিথর, অচেতন হোয়ে যেতে হয়। ৬) সালাহ্ ঠিক মত কায়েম কোরতে হোলে ১০০টির বেশী নিয়ম কানুন মনে রেখে তা পালন কোরতে হয়; ধ্যানে কোন নিয়ম কানুন নেই। ৭) সালাতে চোখ বন্ধ রাখা যাবে না; চোখ বন্ধ না কোরে ধ্যান প্রায় অসম্ভব। ৮) সালাহ্ সক্রিয় *(Active);* ধ্যান নিষ্ক্রিয় *(Inactive)*। ৯) অন্ধকারে সালাহ হয় না, পক্ষান্তরে অন্ধকারই ধ্যানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ, ১০) সালাহ্ প্রচণ্ড গতিশীল, দুর্বার, বিশ্বজয়ী, মৃত্যুভয়হীন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তৈরী করে; ধ্যান দুনিয়া বিমুখ, অন্তর্মুখী রিপুজয়ী সুফি দরবেশ তৈরী করে।

যদি কাউকে বলা হয় তুমি জনাকীর্ণ রাজপথে দৌঁড়াবে আর সেই সঙ্গে ধ্যান কোরবে তাহোলে ব্যাপরটা কি রকম হবে? এটা যেমন হাস্যকর তেমনি হাস্যকর কাউকে বলা যে তুমি সালাহ্ কায়েম কোরবে এবং সেই সঙ্গে ধ্যানও কোরবে। কারণ দৌঁড়াবার সময় যেমন চোখ খোলা রেখে, কোথায় পা ফেলছে তা দেখে, রাস্তার গাড়ি ঘোড়া দেখে দৌঁড়াতে হবে, তখন ধ্যান অসম্ভব, তেমনি সালাতের সময়ও সালাতের ১১৪টি নিয়ম কানুন মনে রেখে, রাকাতের হিসাব রেখে সেগুলি পালন করার সাথে ধ্যান করাও অসম্ভব। সুতরাং সালাহ্ ও ধ্যান বিপরীতমুখী দু'টি কাজ যা একত্রে অসম্ভব। অথচ সালাহ্ সম্বন্ধে আকীদার বিকৃতিতে একে অন্যান্য ধর্মের উপাসনার সাথে এক করার চেষ্টায় এই অসম্ভব আকীদাই আজ মোসলেম হবার দাবীবার এই জনসংখ্যার আকীদা। সালাহ্র উদ্দেশ্য কি, এ ব্যাপারে আকীদার বিকৃতির পর থেকে গত কয়েক শতাব্দী থেকে মোসলেম নামের এই জনসংখ্যাটি দৌঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করার আপ্রাণ চেষ্টা কোরছে এবং ফলে তাদের না দৌঁড় হোচ্ছে না ধ্যান করা হোচ্ছে।

সালাহ ও ধ্যান পরস্পর বিপরীত এ কথার মানে এই নয় যে এর মাধ্যমে সালাহর আধ্যাত্মিক দিক অস্বীকার করা হোচ্ছে। যেখানে সারা জীবনের ধ্যান ও তাসাউফ সাধনা একজন সুফীকে জীবন ত্যাগ কোরতে শেখায় না সেখানে সালাহ এমন এক আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ যা সালাহ কায়েমকারীকে এমন মৃত্যুভয়হীন দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় পরিণত করে যে, সে নির্দ্বীধায় আল্লাহর দুনিয়ায়

আল্লাহর কলেমা প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন ও সম্পদ বিসর্জন দেওয়ার জন্য পস্তুত হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, বর্তমান মোসলেম বলে পরিচিত এ জনগোষ্ঠীর পণ্ডিতগণ সালাহকে সামরিক প্রশিক্ষণ হিসাবে তো মানেই না বরং তারা সালাহকে যে ধ্যান বোলে প্রচার করে তারা সেই ধ্যানও করে না অর্থাৎ ওরা ট্রেনিংও করে না আবার ধ্যানও করে না। তাদের কোনটাই হয় না। কারণ ধ্যান করলে তো অসংখ্য রিপুজয়ী সুফী দরবেশ তৈরী হতো, সেক্ষেত্রে অপরাধ, অন্যায়, অবিচার কিছুটা হলেও তো কমত। তাও হয়নি। বরং তাদের নামায আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় সুরা নিসার ১৪২-১৪৩ নং আয়াত যেখানে আল্লাহ বলছেন "নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে; বস্তুতঃ তিনি তাহাদিগকে উহার শাস্তি দেন আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায় কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তাহারা অল্পই স্মরণ করে; তারা থাকে দোটানায় দোদুল্যমান, না এ দিকে, না ওদিকে। আল্লাহ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না।"

সালাতের আত্মিক ভাগ

প্রাসঙ্গিক কারণে সালাহর আত্মিক বিষয়টি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। সালাতের আত্মা হোচ্ছে যেকরাল্লা, আল্লাহর যেকর করা। যেকর মানে কি? যেকর অর্থ কোন কিছুকে স্মরণ করা, মনে করা। যেমন আপনি আপনার সন্তানের কথা মনে কোরলেন, আপনার বন্ধু বিদেশে আছে, আপনি তার কথা মনে কোরলেন, মানেই আপনি তাদের যেকর কোরলেন। এভাবে আপনি আল্লাহকে মনে কোরলেন মানেই আপনি আল্লাহর যেকর কোরলেন। অর্থাৎ সালাতের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহকে মনে রাখা অর্থাৎ আল্লাহকে যেকর করা এটাই হোল সালাতের আত্মিক ভাগ।

এখন প্রশ্ন হোচ্ছে--আল্লাহকে মনে কোরব কী রূপে, কী ভাবে? প্রথমে মনে কোরতে হবে যাঁর সামনে দাঁড়ানো হোয়েছে তিনি অসীম। অসীম কি? মানুষ সীমিত, ক্ষুদ্র, তার পক্ষে অসীমকে ধারণ করা অসম্ভব। তিনি যেমন অসীম তাঁর সিফতগুলিও তেমনই অসীম। তিনি অসীম রহমান, অসীম রহিম, অসীম রব, অসীম খালেক (স্রষ্টা) ইত্যাদি তাঁর যতো সিফত আছে তাঁর মতোই তাঁর প্রত্যেকটি সিফত অসীম। সালাতে তাহরীম বাঁধার পর এবং কোর'আনের সূরা আবৃত্তি করার পর রুকুতে যেয়ে অর্থাৎ তাঁর কাছে মাথা নত কোরে মনে কোরতে হবে তিনি আযম; অর্থাৎ বিশাল বিরাট, যে বিরাটত্বের, বিশালতার কোন সীমা নেই। এবং এই বিরাট এবং বিশালতা সোবহান অর্থাৎ চুড়ান্ত ত্রুটিহীন, দোষহীন এবং নিখুঁত, যাঁর চেয়ে ত্রুটিহীন এবং নিখুঁত কোন কিছু হয় না। আর মুসল্লী সেই বিশালতার সামনে অতি-অতি ক্ষুদ্র এবং তাঁর সামনে অবনত। তারপর সামি আল্লাহু লেমান হামীদা বোলে দাঁড়াতে হয়, অর্থাৎ মুসল্লী যে তাঁর হামদ ঘোষণা কোরল আল্লাহ তা শুনলেন। অতঃপর সেজদাহ। সেজদায় গিয়ে বোলবে সোবহানা রাব্বি আল আ'লা। আ'লা অর্থ উচ্চতম, অসীম উচ্চ, যে উচ্চতার সীমা নেই এবং এই অসীম উচ্চতা সোবহান অর্থাৎ চুড়ান্ত ত্রুটিহীন, দোষহীন এবং নিখুঁত। মুসল্লী তাঁর সামনে অতি অতি নিচু এবং তাঁর পায়ে সেজদাহ-অবনত। এই অসীম বিশালতা এবং এই অসীম উচ্চতার একত্রিত রূপ আল্লাহু আকবার অর্থাৎ আল্লাহ অতি বড়। এই বড়ত্ব উচ্চতা ও বিশালতা উভয় দিক থেকে। এই বড়ত্বেরও কোন সীমা নেই। আল্লাহর এই রূপকে সর্বক্ষণ মনে রেখে সালাহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কায়েম করাই হোল সালাতে আল্লাহর যেকর, যেকরাল্লাহ।

মুসল্লী যখন রুকুতে গেল তখন তার অবস্থা মোসলেম। এবং যখন সেজদায় গেল তখন সে মো'মেন। মোসলেম হোল যে আল্লাহর সকল হুকুম, বিধানকে সসম্মানে তাসলিম কোরে নেয়। যখন মুসল্লী রুকুতে গেল সে আল্লাহর বিরাটত্বের কাছে নিজের ক্ষুদ্রতাকে সমর্পণ কোরল, তাই তখন সে মোসলেম। আর যখন সে সেজদায় গেল, তখন সে তার সমস্ত সত্ত্বাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ কোরল। এটা মো'মেনের অবস্থা। এ বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার জন্য এখানে একটি নকশা দেওয়া হোল।

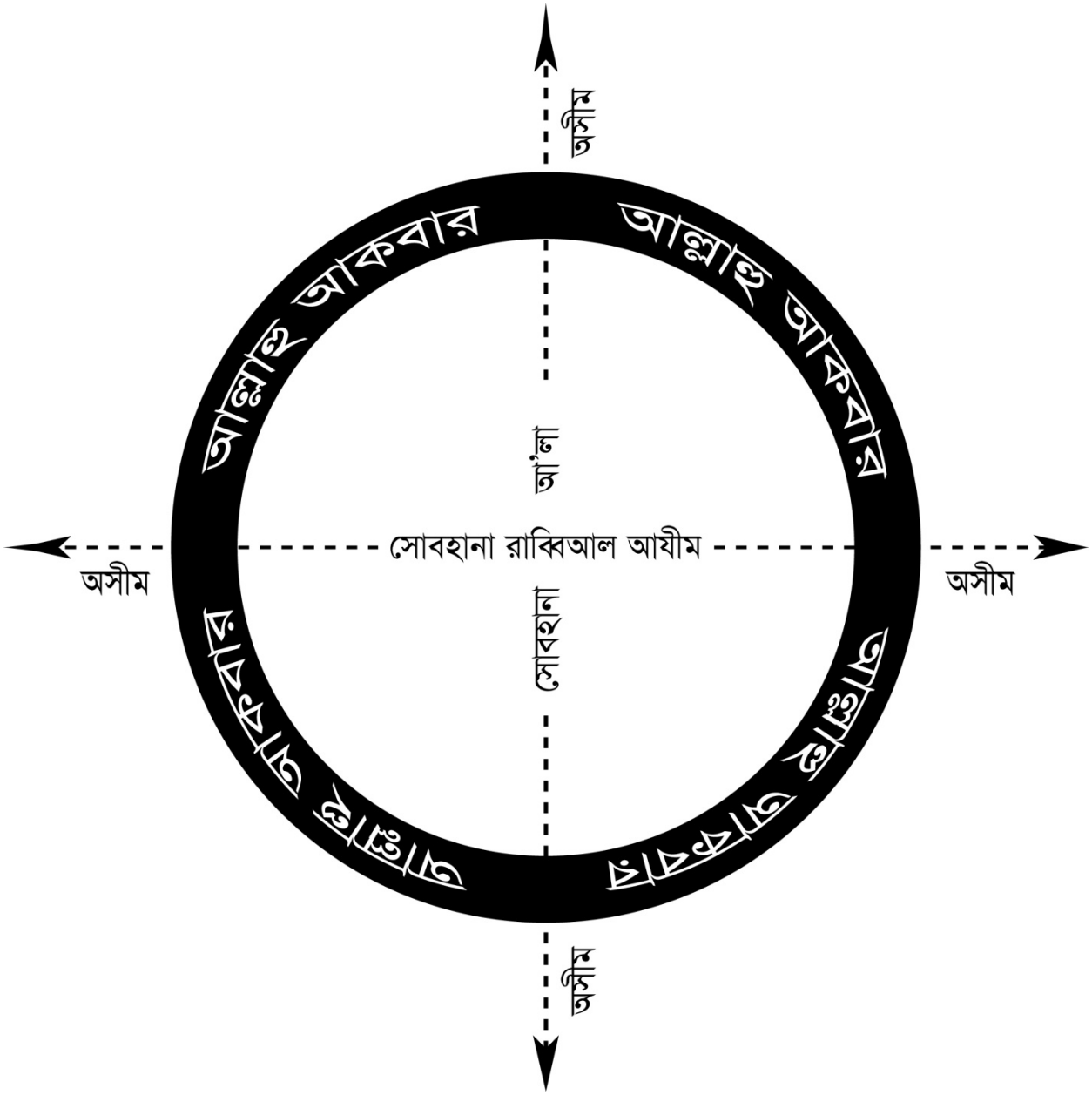

সালাতের রুকুতে, সেজদায় যাওয়ার সময় এবং অন্য সকল চলন *(Movement)* এ যখন আল্লাহু আকবর বলা হয় তখন আল্লারর এই বিরাটত্ব, আযমত ও উচ্চতা সবকিছুই এর মধ্যে চোলে আসে। এই সম্পূর্ণটা মিলিয়েই আল্লাহু আকবার। আল্লাহর এই রূপকে মনে রাখাই হোল সালাতে আল্লাহর যেকর অর্থাৎ যেকরাল্লাহ।

□□□

যারা আল্লাহর রসুলের পদতলে বোসে এসলাম শিখেছিলেন এবং তাঁর হাতে বায়াত নেবার পর বহু বছর তাঁর সঙ্গে দিনে পাঁচবার সালাহ্ কায়েম কোরেছেন তাদের অন্যতম এবং দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রা:) বিন খাত্তাবের আকীদায় সালাহ্ কী ছিলো? একদিন মো'মেন মোজাহেদদের সালাহ্ পর্যবেক্ষণ করার সময় তিনি দেখলেন একজন ঠিকই দৃঢ় এবং সোজাভাবে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু তার মাথাটা খানিকটা সামনের দিকে ঝোঁকানো। ওমর (রা:) ঐ মোজাহিদের মাথা ধোরে উঁচু, সোজা কোরে দিলেন এবং তারপর তার **মাথায় মৃদু আঘাত কোরে বোললেন খুশু এখানে নয়, বোলে তার বুকে আংগুল রেখে বোললেন- খুশু এখানে।**

সামরিক বাহিনীর প্যারেডের সঙ্গে সালাতের মিল শুধু এটুকুই নয়- আরও আছে। আল্লাহ কোর'আনে আদেশ কোরেছেন যে তোমরা সর্বদা মসজিদে যেতে উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ পরে যাবে (কোর'আন সুরা আরাফ আয়াত ৩১)। শব্দ ব্যবহার কোরেছেন 'যিনত', যার অর্থ জাক-জমকপূর্ণ, চাকচিক্যময়। যিনত অর্থ অলংকারও (কোর'আন সুরা নুর আয়াত ৩১)। মস্‌জীদে যে সব কারণে যেতে হয় তার মধ্যে মুখ্য কারণ সালাহ্ কায়েম করা। অর্থাৎ আল্লাহ আদেশ কোরেছেন সালাতে দাঁড়াতে তোমরা জাক-জমকপূর্ণ কাপড়-চোপড়, পরিচ্ছদ পোরে নেবে। প্রশ্ন হোচ্ছে এবাদত করার জন্য, আল্লাহর সামনে বিনীত, বিনয়-নম্র হোয়ে দাঁড়াবার জন্য **অমন সাজ-সজ্জা করার আদেশ কেন?**

যে কারণে একটি সামরিক বাহিনীর প্যারেড, কুচকাওয়াজ করার সময় তাদের পোশাক পরিচ্ছদ অর্থাৎ ইউনিফর্ম একই রকম, ইস্ত্রি করা পরিষ্কার হওয়া বাধ্যতামূলক, ঠিক সেই কারণেই মস্‌জীদে সালাতের সময় জাক-জমকপূর্ণ পোশাক পরার জন্য আল্লাহর এই হুকুম। বর্ত্তমানে সামরিক বাহিনীগুলি জাতির মধ্যে থেকে বেছে বেছে লোক নিয়ে গঠন করা হয়, কাজেই তাদের জন্য একই রকম পোশাক অর্থাৎ ইউনিফর্ম বাধ্যতামূলক করা সম্ভব হয়। কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদী সম্পূর্ণ জাতিটাই একটা সামরিক বাহিনী; যে কথা পেছনে বোলে এসেছি। এর পুরুষ-নারী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব সৈনিক, প্রত্যেকে মোজাহেদ। এদের সবাইকে একই পোশাক পরার আদেশ দেওয়া বাস্তব সম্মত নয়। তাই আল্লাহ তা না দিয়ে যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব উত্তম, জাক-জমকপূর্ণ পোশাক পরে সালাতের, মো'মেনদের কুচকাওয়াজ করার আদেশ দিয়েছেন।

সালাতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আকীদা আজ বিকৃত হোয়ে যাওয়ার ফলে এ জাতির লোকেরা যেমন আঁকাবাঁকা লাইনে মাথা নিচু কোরে; নুব্জ হোয়ে দাঁড়িয়ে যেন-তেন ভাবে সালাতের অনুষ্ঠান করে, তেমনি একই কারণে সাধারণ বাজে কাপড় পরে সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে। এরাই আবার বিয়ে-সাদী এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে তাদের সবচেয়ে ভালো পোশাক পরিচ্ছদ পরে। আল্লাহর রসুলের সময় উম্মতে মোহাম্মদী যে সালাতের পোশাক সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ আমরা পাই হাদীসে রাসুলে। আল্লাহর রসুল বোলেছেন- সামর্থ্য থাকলে তোমরা জুমার সালাতের জন্য একজোড়া আলাদা কাপড় রাখবে, কাজের কাপড় ব্যতিত [আবদুল্লাহ বিন সালিম

(রা:) থেকে ইবনে মাজাহ, মেশকাত]। তিনি আরও হুকুম কোরেছেন- তোমরা সালাহ্ কায়েম করতে অবশ্যই দু'টো কাপড় পরিধান কোরবে (ইবনে ওমর (রা:) থেকে- এমাম তাহাভী, মেশকাত)। এক ব্যক্তি আল্লাহর রসুলের কাছে এসে একটি কাপড় পরে সালাহ্ কায়েম করা বিষয়ে জিজ্ঞাসা কোরলে তিনি বোললেন- তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টো কোরে কাপড় রাখার সামর্থ্য আছে? [আবু হোরায়রা (রা:) থেকে- বোখারী]। অর্থাৎ যাদের দু'টো কাপড় রাখার সামর্থ্য আছে তারা যেন দু'টো কাপড় রাখে এবং ঐ বিশেষ কাপড় পোরে সালাহ্ কায়েম করে।

১. একদা হযরত আবু যর গেফারী (রা:) পুরাতন কম্বলে শরীর আবৃত কোরে পথে বের হোলে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা কোরলো, এই ছেড়া কম্বলটি ছাড়া আপনার কি আর কোন পোশাক ছিল না? তিনি জবাব দিলেন, থাকলে অবশ্যই তুমি তা আমার পরিধানে দেখতে পেতে। লোকটি বললো- তা কি কোরে হয়, মাত্র দুই/তিন দিন আগেই আমি আপনার পরনে অতি উত্তম এক জোড়া পোশাক দেখেছি। আবু যর (রা:) বোললেন, সেটা আমি একজন অভাবী লোককে দিয়ে দিয়েছি। লোকটি মন্তব্য কোরলো, আল্লাহর শপথ! এই দুনিয়ার বুকে আপনার চাইতে অভাবী কোন লোক থাকতে পারে বোলে আমার ধারণা ছিল না। হযরত আবু যর (রা:) জবাব দিলেন, হতভাগা! আমার শরীরেতো একটি কম্বল আছে, সেই লোকটির হয়তো তাও ছিল না। শুন, এই পোশাকটির অতিরিক্ত সালাহ্ কায়েম করার মত একটি 'আবা'ও আমার ঘরে রক্ষিত আছে। আমার কয়েকটি ছাগী আছে, যেগুলি দুধ দেয়। বাহনের জন্য একটি গাধা আছে। কাজকর্ম কোরবার মত একটি বাঁদী আছে। এরপরেও কি আমি অভাবী? আমার তো ভয় হয়, কেয়ামতের দিন এই সম্পদরাশির হিসাব দিতে গিয়েই আমি না অপারগ হয়ে পড়ি। [বিপ্লবী সাহাবী হযরত আবু যর গিফারী (রা:)- মুহিউদ্দিন খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ]।

২. মহানবী (সাঃ) বোলেছেন- তোমাদের কাহারও পক্ষে ইহা আপত্তির বিষয় নয় যে, যদি তাহার সামর্থ্য থাকে জুমার দিনের জন্য একজোড়া পৃথক কাপড় রাখবে কাজের কাপড় ব্যতিত [আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা:) থেকে ইবনে মাজাহ, মেশকাত]।

৩. এক ব্যক্তি রাসুল (রা:) এর কাছে এসে একটি কাপড় পরে সালাহ্ কায়েম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কোরলো। রাসুলুল্লাহ বোললেন, তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টো কোরে কাপড় রাখার সামর্থ্য আছে? [আবু হোরায়রা (রা:) থেকে- বোখারী]

হাদীস গুলোতে দু'টো কাপড় রাখার অর্থ হোচ্ছে- নবী করিমের সময় আরবদের আর্থিক অবস্থা ছিলো অতি করুণ। সমস্ত পৃথিবীতে এত দরিদ্র আর কোন জনসমষ্টি ছিলো কিনা সন্দেহ। অধিকাংশ লোকেরই পরিধানে থাকতো একটি কাপড় কম্বল বা চাদর মাত্র যা দিয়ে তারা শরীরের উর্দ্ধাংশ ও নিম্নাংশ আংশিক ভাবে ঢেকে রাখতেন। শরীরের উর্দ্ধাংশ ও নিম্নাংশের জন্য আলাদা আলাদা কাপড় পরা সম্ভব ছিলো শুধু আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছলদের পক্ষে। এজন্যই রসুলাল্লাহ আদেশ কোরেছেন- যাদের জন্য সম্ভব তারা যেন দু'টো কাপড়, অর্থাৎ উর্দ্ধাঙ্গের জন্য একটি ও নিম্নাঙ্গের জন্য আরেকটি কাপড় সালাতের সময় পরে নেয়, অর্থাৎ যে যতখানি পারে 'যিনত'

সাজ-সজ্জা, জাক-জমক প্রকাশ করে। পরে যখন উম্মতে মোহাম্মদী জেহাদ ও কেতালের (সংগ্রাম ও সশস্ত্র যুদ্ধের) মাধ্যমে অর্দ্ধেক পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করে তখন আরবের ঐ চরম দারিদ্র্য শেষ হোয়ে প্রাচুর্যে ভরে যায় এবং তখন আল্লাহর আদেশ- সালাতে 'যিনত' প্রদর্শন পুরোপুরি অর্থবহ হয়।

প্রকৃত তওহীদ ও জেহাদ অর্থাৎ মো'মেন হবার আল্লাহর দেয়া সংজ্ঞা (সুরা হুজরাত- ১৫) থেকে বিচ্যুত, আল্লাহর অভিশপ্ত (লা'নত প্রাপ্ত) এই জাতিকে সালাতের উদ্দেশ্য বোঝাবার চেষ্টায় ইতিহাস (তা'রিখ) ও হাদীস থেকে দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা:) বিন খাত্তাবের উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি চাবুক হাতে মুসুল্লীদের লাইনের মধ্য দিয়ে হাটতেন এবং কাউকে ধনুকের ছিলার মত সোজা লাইন থেকে বা অন্য কোন বিচ্যুতি দেখলে এবং চাবুক দিয়ে আঘাত করতেন। যারা সালাহ্, তাদের ভাষায় নামাযের উদ্দেশ্য ধ্যান করা মনে করেন (এবং এই আকীদাই মোসলেম দুনিয়ায় আজ সর্বব্যাপী), তাদের কাছে আমার প্রশ্ন- **চাবুক মেরে কি মানুষকে ধ্যান করানো যায়?** ওমরের (রা:) কাজ কি সৈন্য বাহিনীর প্যারেডের সার্জেন্ট মেজরের *(Serjeant Major)* কাজের সাথে মিলে না, যে প্যারেডের প্রশিক্ষণে ভুল ত্রুটি হোলে গালি দেয়, পিটায়? আর প্রথম সারির আসহাব, এসলামের দ্বিতীয় খলিফা জানতেন না সালাহ্ ধ্যান করার জন্য নাকি সামরিক প্রশিক্ষণ? আল্লাহর লা'নতের ফলে এ জাতির সাধারণ জ্ঞান *(Common sense)* পর্যন্ত লোপ পেয়েছে।

আল্লাহ কোর'আনের সর্বত্র আদেশ কোরেছেন, মো'মেনদের আদেশ কোরেছেন, সালাহ্ কায়েম কর, কোথাও বলেননি সালাহ্ পড় বা সালাহ্ আদায় কর। আল্লাহ সালাহ্ কায়েম করতে কেন বোলেছেন এ নিয়ে আলেম, মুফাস্সিরদের মধ্যে বহু আলোচনা, ব্যাখ্যা হোয়েছে। বেশীর ভাগের ব্যাখ্যা হোচ্ছে- খুব নিয়মিত এবং সময় মত, সালাহ্ পড়া, কোন কাযা না করা। এ ব্যাখ্যা ভুল, কারণ কোন কাযা না কোরে নিয়মিত, এবং সময়মত সালাহ্ পড়েও সালাহ্ কায়েম নাও হোতে পারে। কায়েম শব্দের অর্থ প্রতিষ্ঠা; চিরদিনের জন্য, স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা। **সালাহ্ কায়েম করার অর্থ সালাহ্ যা শেখায় যে গুণগুলি তৈরী করে তা মুসুল্লীর চরিত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা; স্থায়ীভাবে গেঁড়ে দেয়া।** সালাহ্ যদি মুসুল্লীর চরিত্রে ঐ গুণগুলি তৈরী না করে তবে সারা জীবনে এক ওয়াক্ত সালাহ্ কাযা না কোরলেও সে মুসুল্লীর সালাহ্ কায়েম করা হবে না। প্রশ্ন হোচ্ছে, সালাহ্ কি কি রকম গুণ *(Attributes, Quality)* তৈরী করে? এর সম্পূর্ণ তালিকা, আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়; কোন মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়, এ সম্ভব শুধু আল্লাহর পক্ষে এবং সম্ভবত আল্লাহর রসুলের পক্ষে। তবে আমি শুধু এইটুকু বোলতে পারি যে **দৈহিক, মানসিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক, সমস্ত রকমের গুণের অর্জন ও উন্নতির প্রক্রিয়া এই সালাহ্ যদি তা সঠিক আকীদার সঙ্গে এবং সঠিক ভাবে কায়েম করা হয়।** তবে এর প্রথম ও সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হোল সেই সব গুণ অর্জন করা যে সব গুণ চরিত্রে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হোলে মো'মেনের ওপর ঈমানের পরই দ্বিতীয় যে দায়িত্ব, যে দায়িত্ব মো'মেন হবার সংজ্ঞার মধ্যেই আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন, [মো'মেন শুধু তারা যারা আল্লাহ ও রসুলের ওপর ঈমান এনেছে তারপর আর কোন সন্দেহ করে না এবং তাদের

প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে জেহাদ করে (ঐ তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য) (কোর'আন- সুরা হুজরাত ১৫)] অর্থাৎ জেহাদ করা সম্ভব নয়। সে গুণগুলি হোল- ঐক্য, শৃংখলা, এতায়াত (আদেশ পালন) ও হেজরত। এই সামরিক গুণগুলি অর্জনই সালাতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য, তার কারণ **পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া হিসাবে আল্লাহ জেহাদ ও কেতালকে (সশস্ত্র যুদ্ধ) নীতি হিসাবে নির্দ্ধারণ কোরেছেন।** ঐ প্রাথমিক গুণগুলি অর্জন ও মুসুল্লীর চরিত্রের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠার পর অন্যান্য গুণাবলিও ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আকীদার সঙ্গে এবং আল্লাহ-রসুল যে ভাবে যে নিয়ম নির্দ্ধারিত কোরে দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে আজ পৃথিবীতে সালাহ্ সম্পাদন হয় না বোলেই সালাতের কোন ফল নেই। **যে সালাহ্ মুসুল্লীদের চরিত্রে ইস্পাতের মত কঠিন ঐক্য সৃষ্টি করে না, পিঁপড়ার মত শৃংখলা, মালায়েকদের মত আদেশ পালন, আনুগত্য সৃষ্টি করে না, আল্লাহর বিরুদ্ধে যা কিছু আছে সে সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন, হেজরত করায় না, শাহাদাতের জন্য আকুল আকাঙ্খা জন্মায় না, শত্রুর প্রাণে ত্রাস সৃষ্টিকারী দুর্ধর্ষ মোজাহেদ, যোদ্ধার চরিত্র সৃষ্টি করে না, সে সালাহ্ অর্থহীন, সে সালাতের আনুষ্ঠানিকতা করা- না করা সমান।**

আল্লাহ মো'মেনদের আদেশ কোরছেন- তোমরা সালাহ্ ও সবরের সাথে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো (বাকারা ১৫৩)। আদেশটি গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ। এ আদেশের অর্থ বুঝতে গেলে সালাতের সঙ্গে সবরের অর্থও বুঝতে হবে। বর্ত্তমানের বিকৃত এসলামের ভুল আকীদায় সবরের অর্থ ধৈর্য, সহ্য করা ইত্যাদি। সবর শব্দটি শুনলেই মনে যে আকীদাটা উদয় হয় তা জড়, অসাড়, নিষ্ক্রিয় (Passi ve)। অর্থাৎ সবর করা মানে নিষ্ক্রিয়, জড় হোয়ে সব অন্যায়, অত্যাচার-অবিচার সহ্য করা, কিছু না করা, এমনকি অনেকের কাছে প্রতিবাদ পর্যন্ত না করা। সবর শব্দের প্রকৃত অর্থ, যে অর্থে আল্লাহ তাঁর কোর'আনে এবং রসুল তাঁর হাদীস ব্যবহার কোরেছেন তা বর্ত্তমানের এই অর্থের ঠিক বিপরীত। প্রচণ্ড গতিশীল *(Dynamic)* এসলামকেই যেমন আকীদার বিকৃতিতে স্থবির *(Static)* কোরে ফেলা হোয়েছে তেমনি সবর শব্দের অর্থকেও নিষ্ক্রিয় অর্থে নেয়া হোচ্ছে। সবর শব্দের অর্থ বাংলায় বোঝাতে গেলে বোলতে হয় 'সংকল্পের দৃঢ়তা' ইংরাজীতে *Determined Perseverance;* কোন উদ্দেশ্য অর্জন কোরতে দৃঢ়ভাবে সমস্ত কিছু সহ্য করা। যত বাধা আসুক, যত বিপদ-আপদ আসুক, যত কষ্ট হোক, বিন্দুমাত্র নিরাশ বা হতাশ না হোয়ে পর্বতের মত অটল থেকে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা, সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। জেহাদে, যুদ্ধে এই সবর অবলম্বনেরই আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ তাঁর কোর'আনে এবং বোলেছেন আমি স্বয়ং সাবেরদের (সবর অবলম্বনকারীদের) সাথে আছি (কোরান- সুরা বাকারা ১৫৩)।

এখন একটু চিন্তা কোরলেই বোঝা যাবে আল্লাহ সালাতের এবং সবরের সঙ্গে তাঁর কাছে দোয়া কোরতে বোলছেন কেন? তিনি সালাহ্ ও যাকাতের সঙ্গে, সালাহ্ ও হজের সঙ্গে, সালাহ্ ও সওমের (রোযা) সঙ্গে, কোন কিছুর সাথেই না বোলে সালাহ্ ও সবরের সাথে বোলেছেন কেন? সালাহ্ মো'মেনের চরিত্রের মধ্যে যে অসংখ্য গুণ সৃষ্টি করে তার মধ্যে শুধু প্রাথমিক যে কয়টি, অর্থাৎ ঐক্য, শৃংখলা, আনুগত্য ও হেজরত এই কয়টির সঙ্গে যদি সবরের গুণগুলি অর্থাৎ

সংকল্পের দৃঢ়তা, প্রাণ থাকতে নিরাশ, হতাশ, নিরুদ্যম না হোয়ে অটল থেকে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি যোগ করা হয় তবে কি দাঁড়ায়? দাঁড়ায় এই যে ব্যক্তি হোক, পরিবার হোক, গোত্র হোক, জাতি হোক যাই হোক, সালাতের সৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হোয়ে সবরের সঙ্গে সংগ্রাম প্রচেষ্টা কোরলে সে বা তারা অজেয়, অপরাজিত হোয়ে যায়, সফলতা বিজয় তাদের জন্য অবধারিত হোয়ে যায়। তাই আল্লাহ আদেশ কোরেছেন শুধু সালাতের সঙ্গে নয় সালাতের সঙ্গে সবরেরও। আরও বোলেছেন- নিরাশ হোয়ো না, নিরুদ্যম হয়োনা বিজয়ী তোমরা হবেই, যদি তোমরা মো'মেন হও (সুরা আল এমরান- ১৩৯)। অর্থাৎ আমরা যদি সত্যই মো'মেন হই তবে বিজয়ী আমরা হবোই এটা আল্লাহর দেয়া প্রতিশ্রুতি।

বর্ত্তমানে মো'মেন বোলে পরিচিত ১৫০ কোটির এই জাতিটি পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জাতির কাছে প্রত্যেক ব্যাপারে পরাজিত, তাদের দ্বারা লান্ছিত, অপমানিত, তাদের দ্বারা নিহত, এদের মেয়েরা তাদের দ্বারা গণধর্ষিতা। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে আল্লাহর কথা যদি সত্য হোয়ে থাকে তবে এই জাতি মো'মেন নয় এবং মো'মেন না হওয়ার অর্থ অবশ্যম্ভাবী মোশরেক, কাফের হওয়া; এবং আল্লাহ অঙ্গীকার কোরেছেন যে তিনি মোশরেক ও কাফেরদের মাফ কোরবেন না (সুরা নেসা- ৪৮, ১১৬, সুরা কাহফ- ১০২, ১০৫, ১০৬)। এই দুনিয়াতে তিনি যেমন মাফ কোরছেন না, অন্যান্য জাতিগুলি দিয়ে নিষ্পেষিত কোরে কঠিন শাস্তি দিচ্ছেন, ঐ দুনিয়াতে এই জাতিকে এর চেয়ে কঠিন শাস্তি দেবেন। আর যদি বর্ত্তমানের মোসলেম বোলে পরিচিত জনসংখ্যাটি তাদের দাবী মোতাবেক মো'মেন হোয়ে থাকে তবে আল্লাহ মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছেন (নাউজুবেল্লাহ)।

বিকৃত আকীদায় বর্ত্তমানের বিপরীতমুখী এসলামে সালাহ্কে অন্যান্য ধর্মের উপাসনা, পূজা হিসাবে নেয়ার ফলে আজ এটা আল্লাহর-রসুলের শেখানো সালাহ্ থেকে বিচ্যুত, সুতরাং সালাতের উপকার থেকে বঞ্চিত। সালাহ্ যে ধ্যান, আল্লাহর প্রতি নিবিষ্টতা তা প্রমাণ কোরতে একটা হাদীস উপস্থাপন করা হয়। সেটা হোল- একবার এক যুদ্ধে আলীর (রা:) পায়ে একটি তীর বিঁধে যায়। লোকেরা যখন তীরটি টেনে বের করার চেষ্টা করলো তখন তিনি তীব্র ব্যাথায় তাদের তীরটি খুলতে দিলেন না। অথচ তীরটি তাঁর পা থেকে না খুললেই নয়, তাই তারা বিশ্বনবীর কাছে যেয়ে ব্যাপারটা বোললেন। আল্লাহর রসুল শুনে বোললেন- আলী যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন তোমরা তীরটি বের কোরে নিও। এরপর আলী (রা:) যখন সালাতে দাঁড়ালেন তখন তাঁর পা থেকে তীরটি টেনে বের কোরে নেয়া হোল, তিনি নড়লেন না, টু শব্দটিও কোরলেন না।

এই ঘটনাকে বর্ত্তমানের বিকৃত আকীদায় নেয়া হয় এইভাবে যে, সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় আলী (রা:) আল্লাহর চিন্তায় এমন বিভোর হোয়ে যেতেন যে তার বাহ্যজ্ঞান থাকতো না, দুনিয়ায়, চারপাশে কি হোচ্ছে না হোচ্ছে তার তিনি কিছুই জানতেন না, এমন কি যে তীর টেনে বের করার চেষ্টায় তাঁর অসহ্য ব্যাথা লাগতো সে তীর টেনে বের করার ব্যাথাও তিনি অনুভব কোরলেন না। প্রশ্ন হোচ্ছে- সালাতে যদি আলীর (রা:) ঐ অবস্থা হয় তাহোলে তিনি এমামের

তকবীর শুনতেন কেমন কোরে, সেই তকবীর শুনে রুকু-সাজদায় যেতেন কেমন কোরে, সালাতের একশ'র বেশী নিয়ম-কানুন মোতাবেক সালাহ্ কায়েম কোরতেন কি ভাবে, কয় রাকাত পড়লেন তা মনে রাখতেন কি ভাবে? ধ্যান-মগ্ন হোয়ে বাহ্যজ্ঞানহীন হোয়ে এমন কি শারীরিক ব্যাথা-যন্ত্রণা পর্যন্ত লোপ পেয়ে সালাহ্ কায়েম কি সম্ভব? সামান্য সাধারণ জ্ঞান যার আছে তিনিই বুঝবেন- অসম্ভব। অথচ ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য [হযরত আলী- আবুল ফজল, পৃষ্ঠা- ১৩২, চার খলিফার জীবন কথা- আব্দুল আজীজ আল নোমান, পৃষ্ঠা- ১০৫, হযরত আলী (রা:)- মাওলানা মুজিবুর রহমান মমতাজুল মোহাদ্দেসীন, পৃষ্ঠা- ৪০৩, আমীরুল মো'মেনিন হযরত আলী (রা:)- সাদেক শিবলী জামান, পৃষ্ঠা- ৪৩৮] ।

তাহোলে আসল ব্যাপার কি? আসল ব্যাপার হোচ্ছে এই- আলী (রা:) এসলাম কি, এসলামের সঠিক আকীদা অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য কি, উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া কি, সালাতের উদ্দেশ্য কি এসবই শিখেছিলেন আর কেউ নয় স্বয়ং আল্লাহর রসুলের কাছ থেকে; কাজেই তাঁর আকীদা অবশ্যই সঠিক ছিলো। সেই সঠিক আকীদা মোতাবেক তিনি জানতেন যে সালাহ্ চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ এবং সামরিক প্রশিক্ষণ; এই প্রশিক্ষনের জন্য দাঁড়ালে, দাঁড়াতে হবে শরীর, মেরুদণ্ড, ঘাড় সোজা কোরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে নির্দিষ্ট স্থানে, এমামের তকবিরের সঙ্গে সকলে একত্রে দ্রুত রুকু, এতে'দাল, সাজদা ও সালাম কোরতে হবে। তিনি এও জানতেন যে সালাতে দাঁড়ালে নিজেকে এমনভাবে শৃংখলাবদ্ধভাবে রাখতে হবে যে এদিক ওদিক তাকানো যাবে না, চোখ বন্ধ কোরে রাখা যাবে না, কাপড় বা মাথার চুল সোরে গেলে তা হাত দিয়ে ঠিক করা যাবে না, কাশি বা হাইতোলা যথাসম্ভব রোধ কোরতে হবে, এমন কি সাজদার স্থানে ধূলাবালি বা কপালে ব্যাথা লাগতে পারে এমন পাথর-কুচি বা কাঁকর থাকলেও ফু দিয়ে বা হাত দিয়ে সরানো যাবে না, এক পায়ে একটু বেশী ভর দেওয়া চোলবে না। এর যে কোন একটি কোরলেই সালাহ্ ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হবে; অর্থাৎ এক কথায় সামরিক শৃংখলা। পা থেকে তীর টেনে বের করার সময় আলীর (রা:) নিশ্চয়ই তীব্র ব্যাথা লেগেছিল, কিন্তু তিনি দাঁতে দাঁত চেপে সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন সালাহ্ নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হবার ভয়ে। এই ঘটনাকে আলীর (রা:) ধ্যান-মগ্ন হোয়ে সালাহ্ কায়েমের প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করা যায় শুধু সাধারণ জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে লোপ পেলে এবং আল্লাহর লা'নত যাদের ওপর পড়ে তাদের যে সব শাস্তি হয় তার মধ্যে অন্যতম হোল আকল (আক্কেল) অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞান *(Common sense)* লোপ পাওয়া, তাই হোলে।

আলীর (রা:) এই ঘটনার সঙ্গে আরও একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না কোরে পারছি না। এসলামের প্রকৃত সালাহ্ যে কি রকমের চরিত্র সৃষ্টি কোরতো, মো'মেনের চরিত্রের মধ্যে ঐক্য, শৃংখলা, আনুগত্য ও হেজরতের গুণের সঙ্গে সঙ্গে যে কি কঠিন সবরও সৃষ্টি কোরত তার একটা উদাহরণ এই ঘটনাটি।

বনি আউস বিন লাইস গোত্রের গালীব বিন আবদুল্লাহ আল কালবিকে (রা:) আল্লাহর রসুল একদল অশ্বারোহী দিয়ে প্রেরণ কোরলেন বনি আল-মুলাওয়াহ গোত্রকে আক্রমণ করার জন্য। ঐ

গোত্র তখন আল কাদীদ নামক স্থানে অবস্থান কোরছিলো। এই দলে ইয়াকুব বিন ওতবা আল মুগীরা সানিল (রা:) নামে এক সাহাবা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। **বিশ্বনবীর আদেশ ছিলো ঐ গোত্রকে রাত্রে আক্রমণ করার।** অশ্বারোহী মোজাহেদ দল সূর্যাস্তের সময় আল কাদীদ উপত্যকায় এসে পৌঁছলো। বনি মুলাওয়াহর অবস্থান ও অন্যান্য খবরাখবরের জন্য ইয়াকুব বিন ওতবাকে (রা:) পাঠানো হোল। ঐ গোত্র যে উপত্যকায় অবস্থান কোরছিলো তার পাশেই একটা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে ইয়াকুব (রা:) সাবধানে ওদের পর্যবেক্ষণ কোরতে লাগলেন।

এরই মধ্যে ঐ পাহাড়ের কাছেই একটি তাবু থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে চারদিক দেখতে লাগলো এবং হঠাৎ সে ইয়াকুবকে (রা:) দেখে ফেললো। কিন্তু সন্ধ্যা এত গাঢ় হোয়ে গিয়েছিলো যে সে বুঝলোনা যে ওটা মানুষ না অন্য কিছু। সে তাবুর ভেতরে তার স্ত্রীকে ডেকে বললো- আমি একটা কিছু দেখতে পাচ্ছি যা দিনে ওখানে দেখি নি। দেখতো কুকুর আমাদের কোন জিনিস ওখানে নিয়ে ফেলেছে কিনা। স্ত্রী তাবুর ভেতরের সব জিনিস খোঁজ কোরে বোললো- না এখানে সব ঠিক আছে। তখন লোকটি তার স্ত্রীকে বোললো- তাহোলে আমার ধনুকটা আর দু'টো তীর নিয়ে এসো। স্ত্রী তীর-ধনুক নিয়ে এলে লোকটি ইয়াকুবকে (রা:) লক্ষ্য কোরে একটি তীর ছুড়লো। তীর এসে ইয়াকুবের (রা:) পাঁজড়ে লাগলো। ইয়াকুব (রা:) জানেন যে তিনি বিন্দুমাত্র নড়লেই লোকটি বুঝবে যে ওটা কোন মানুষ এবং সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ কোরে তার গোত্রকে সতর্ক কোরে দেবে যে শত্রুপক্ষের কোন লোক গোয়েন্দাগিরি কোরতে এসেছে। ইয়াকুব (রা:) অতি সাবধানে না নড়ে একহাত দিয়ে তীরটি পাঁজড় থেকে টেনে বের কোরে রেখে দিলেন। বনি মুলাওয়াহর লোকটি তবুও নিঃসন্দেহ না হোয়ে তার দ্বিতীয় তীরটি ছুড়লো। এবারের তীর ইয়াকুবের (রা:) কাঁধে এসে ঢুকলো। এবারও তিনি না নড়ে আস্তে সাবধানে তীরটি টেনে খুলে রাখলেন। এবার ঐ লোকটি তার স্ত্রীকে বোললো আমার দু'টো তীরই ঠিক লেগেছে। ওটা যদি কোন দলের গুপ্তচর বা জীবন্ত কিছু হোত তবে নিশ্চয় নড়তো। সকালে ঐ তীর দু'টো পাহাড়ের ওপর থেকে নিয়ে এসো- নইলে আমাদের কুকুর হয়তো কামড়িয়ে নষ্ট কোরবে।

ইয়াকুবের (রা:) এই যে অবিশ্বাস্য সহ্যশক্তি, সবর, একটুও না নড়ে নিজের শরীর থেকে দু-দু'টি তীর টেনে বের করা এটা কোথা থেকে এলো? নিঃসন্দেহে এটা সালাতের শিক্ষা, সালাতের প্রশিক্ষণের ফল। ঠিক যে কারণে আল্লাহর রসুল সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় আলীর (রা:) পা থেকে তীর টেনে বের কোরতে বোলেছিলেন। অবশ্য আলী (রা:) ও ইয়াকুবের (রা:) ঐ সহ্যশক্তির পেছনে সালাতের শৃংখলার প্রশিক্ষণ ছাড়াও সঠিক আকীদারও তেজ ছিলো।

যে উদ্দেশ্যে আল্লাহর নবীর জীবনী থেকে এই ঘটনাটা বর্ণনা কোরলাম তা এখানেই শেষ; সালাহ্ কায়েমের ফল। কিন্তু ঘটনাটার বাকি অংশটুকুও বর্ণনা করার লোভ সংবরণ কোরতে পারছি না, যদিও তা প্রাসঙ্গিক নয়। কারণ ঘটনাটা থেকে সালাতের প্রশিক্ষণ ছাড়াও আরও দু'টি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় জানা যায়। একটি এসলামের জেহাদ, কেতাল, যুদ্ধ যে আত্মরক্ষামূলক নয় বরং

প্রচণ্ডভাবে আক্রমণাত্মক এ কথার অকাট্য প্রমাণ এবং দ্বিতীয়টি মো'মেনদের সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব (সুরা রূম ৪৭) একথার সত্যতা।

ঘটনাটার পরের বর্ণনা হোচ্ছে এই যে ইয়াকুবের (রা:) ঐ পর্বতসম সবরের ফলে শত্রুপক্ষ মোসলেম বাহিনীর উপস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ রোয়ে গেল এবং খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। মোজাহেদ বাহিনী সারারাত্রি অপেক্ষা কোরে শেষরাত্রে মুলাওয়াহ গোত্রের ওপর অতর্কিত আক্রমণ কোরে তাদের বেশ কিছু লোক হত্যা কোরে তাদের উট, দুম্বা, ছাগল এবং অন্যান্য সম্পদ নিয়ে রওনা দিলো। কিন্তু ইতিমধ্যেই ঐ গোত্রের লোকজন (গোত্রটি বেশ বড় গোত্র ছিলো) সব একত্র হোয়ে তাদের পিছু নিলো। মোজাহেদ বাহিনীর গতি স্বভাবতই শত্রুর চেয়ে অনেক কম ছিলো কারণ তাদের সঙ্গে বহু উট, ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদি ছিলো আর শত্রুদের সঙ্গে এসব কিছুই ছিলোনা এবং অতি শীঘ্রই তারা মোজাহেদের কাছে এসে গেলো। যখন বনি-মুলাওয়াহ গোত্রের অসংখ্য লোক মোজাহেদের ধাওয়া কোরে প্রায় ধোরে ফেলেছে তখন ঐ গোত্র ও তাদের মধ্যে শুধু কুদাইদের ওয়াদি। আরবে নিম্নস্থানকে ওয়াদি বলা হয়। ঠিক এমনি সময় মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, কোথা থেকে বন্যার মত পানি এসে ওয়াদি ভরে গেলো। বনি-মুলাওয়াহ গোত্রের একটি মানুষও ঐ ঢলের পানি পার হোয়ে ওপারে যেতে পারলো না; তারা অসহায় হোয়ে ওয়াদির এপারে দাঁড়িয়ে রোইল এবং মোজাহেদ বাহিনী সমস্ত টাকা পয়সা, উট, দুম্বা, ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদি নিয়ে চোলে গেলো এবং মদিনা পৌঁছে আল্লাহর রসুলের দরবারে পেশ কোরলো (সিরাতে রসুলাল্লাহ, মোহাম্মদ ইবনে এসহাক, অনুবাদ *A. Guillaume* পৃ৬৬০-৬৬১)।

এসলামের সঠিক প্রকৃত আকীদার বিকৃতির ফলে ঈমানের, মো'মেন হবার সংজ্ঞার মধ্যেই যে জেহাদের শর্ত্ত; ঈমান আনার পরই যে কাজের স্থান সেই জেহাদকে ত্যাগ করার পর ঐ কাজকে যথার্থ প্রমাণ করার জন্য প্রচার করা আরম্ভ হোল যে, এসলামের জেহাদ, যুদ্ধ শুধু আত্মরক্ষামূলক; এসলাম আক্রমণাত্মক যুদ্ধ সমর্থন করে না। এই প্রচার এসলামের আকীদার মর্মমূলে যেয়ে আঘাত কোরলো। এসলামে জেহাদ, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং কেতাল অর্থাৎ সশস্ত্র যুদ্ধ শুধু আত্মরক্ষামূলক একথা তেরশ' বছর আগে প্রচার করা শুরু হোয়েছিলো জেহাদ ছেড়ে দেবার কৈফিয়ত হিসাবে যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য। তারপর জেহাদ ত্যাগ করার অমার্জনীয় অপরাধের শাস্তি হিসাবে উম্মতে মোহাম্মদীর হাত থেকে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে ইউরোপের খ্রীস্টান জাতিগুলির হাতে তুলে দিয়ে এই জাতিকে যখন আল্লাহ মো'মেনের গণ্ডী থেকে বহিষ্কার কোরে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জাতিগুলির পদাঘাত, লাথীর বস্তুতে পরিণত কোরে দিলেন, আল্লাহর লা'নতের ফলে হীন-মন্যতায় এই জাতির আত্মা পর্যন্ত আপ্লুত হোয়ে গেলো, তখন তারা ঐ কথা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকেও বোলতে শুরু কোরলো। তারা করজোড়ে অন্যান্য জাতিকেও বোলতে লাগলো যে আপনারা যে এই মোসলেম জাতিকে অপবাদ দেন যে, আমরা তলোয়ারের জোরে পৃথিবীতে এসলাম প্রতিষ্ঠা কোরেছি, এটা মোটেই সত্য নয়। আমরা অতি নিরীহ গোবেচারা জাতি, আমরা কখনই অন্যকে আক্রমণ কোরি না। এই দেখুন আমাদের হাতে কোন অস্ত্র আছে? দেখুন এ হাতে

কোন অস্ত্র নেই; আছে তসবিহ্। তবে নেহায়েৎ যদি কেউ আমাদের আক্রমণ করে তবে আমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা কোরি মাত্র।

যে ঘটনাটার কথা পেছনে উল্লেখ কোরেছি তাতে আল্লাহর রসুল হুকুম দিয়েছিলেন শত্রু গোত্রটাকে রাত্রে আক্রমণ কোরতে, অর্থাৎ ঘুমন্ত অবস্থায়। মোজাহেদ দল তাই কোরেছিলেন, বনি-মুলাওয়াহ গোত্রকে ঘুমিয়ে পড়ার সময় দিয়েছিলেন এবং শেষরাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ কোরেছিলেন। আদেশটি ছিলো স্বয়ং আল্লাহর রসুলের। শুধু এই ঘটনাই নয়। নবীর জীবিত অবস্থায় খন্দকের যুদ্ধ ও তার পৃথিবী থেকে চোলে যাবার পর বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে মদিনাকে রক্ষার যুদ্ধ; এই দু'টি ছাড়া আর কোন যুদ্ধই আত্মরক্ষামূলক ছিলো না। এর পর এসলামের যুদ্ধ, জেহাদ ও কেতালকে আত্মরক্ষামূলক বোলে প্রচার করা কী কোরে সম্ভব! ঐ যুদ্ধ দু'টিও আসলে সম্পূর্ণভাবে আত্মরক্ষামূলক নয়, সামগ্রিক যুদ্ধের মধ্যে কখনও কখনও আক্রমণ প্রতিহত কোরতে হয়, ওটা গোটা যুদ্ধেরই একটা পর্যায়।

অন্য যে শিক্ষা এই ঘটনা থেকে পাই তা হোচ্ছে কোর'আনে দেয়া আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পালন। আল্লাহ বোলেছেন- আল্লাহ মো'মেনদের ওয়ালী অর্থাৎ অভিভাবক (কোরান, সুরা আল এমরান ৬৮)। আরও বোলেছেন- মো'মেনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব (কোরান- সুরা রূম ৪৭)। মোজাহেদ বাহিনীর পেছনে বিপুল সংখ্যক শত্রু তাড়া কোরে প্রায় এসে পড়েছে, তাদের তুলনায় মোজাহেদরা অতি অল্প সংখ্যক, মোজাহেদরা একটা নিম্নভূমি পার হোয়ে ওপারে উঠেছেন, শত্রুরা এপারে এসে গেছে; এমনি সময় মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই আল্লাহর আদেশে হঠাৎ কোথা থেকে বন্যার পানির ঢল এসে ঐ নিম্নভূমি প্লাবিত কোরে দিলো। একটি শত্রুও পার হোতে পারলো না। আল্লাহ তাঁর দায়িত্ব পালন কোরলেন। এ ঘটনাটা আল্লাহর নবী মুসার (আ:) ঘটনা মনে কোরিয়ে দেয়। মুসার (আ:) নেতৃত্বে বনি-এসরাঈলীদের রক্ষা করার জন্য সমুদ্র দু'ভাগ কোরে তাদের পার কোরে দিয়ে শত্রুদের ডুবিয়ে মারার মো'জেজা। সেটা ছিলো নবীর মো'জেজা আর এ ঘটনা শ্রেষ্ঠ নবীর আসহাবদের মো'জেজা, প্রকৃত উম্মাতে মোহাম্মদীর মো'জেজা।

আমরা আবার সালাতে ফিরে যাচ্ছি। পৃথিবীর সব জাতিই বর্ত্তমানে দু'ভাগে বিভক্ত। সামরিক ও বেসামরিক *(Military & Civilian)*। বেসামরিক ভাগ সরকার গঠন কোরে নিজেরা আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি তৈরী কোরে সেই মোতাবেক দেশ শাসন করে অর্থাৎ শেরক ও কুফরী করে, আর সামরিক ভাগ বেসামরিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে সেনা ছাউনীতে থেকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয় দেশকে রক্ষা করার, প্রয়োজনে অর্থাৎ বেসামরিকদের সিদ্ধান্ত হোলে অন্য দেশ-জাতিকে আক্রমণ করার জন্য। বর্ত্তমানে নিজেদের মূল থেকে, আকীদা থেকে, দীন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, আল্লাহ-রসুলের দেখানো দিক নির্দেশনার (হেদায়াহর) বিপরীতমুখে চলমান এই মোসলেম জাতিও অন্যদের অনুকরণে ঐ দু'ভাগে বিভক্ত। কিন্তু আল্লাহর শেষ নবী যে জাতি গঠন কোরলেন, যার নাম উম্মাতে মোহাম্মদী, এটার মধ্যে কোন ভাগ নেই; সম্পূর্ণ জাতিটাই সামরিক। এ জাতির সর্বোচ্চ নেতা থেকে নিম্নতম মানুষটি পর্যন্ত প্রত্যেকে মোজাহেদ, যোদ্ধা। যে যোদ্ধা নয়

এ জাতিতে, এই উম্মাহতে তার স্থান নেই। এ জাতিতে নির্বাচিত সংসদ *(Parliament)* নেই কারণ আইন তৈরীর কোন প্রয়োজন নেই; আল্লাহর দেয়া আইন-কানুন দণ্ডবিধি, অর্থনীতি সমস্তই মজুদ আছে; এবং আছে শুধু এমাম এবং এমামের নিযুক্ত স্থানীয় আমীররা *(Commanders)* আল্লাহর ঐ আইন কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি অর্থাৎ দীনুল এসলামকে প্রতিষ্ঠিত কার্যকরী রাখার জন্য। এক কথায় সমস্ত জাতিটি একটি সামরিক বাহিনী, নারী-পুরুষ প্রত্যেকে এক একটি সৈনিক, মোজাহেদ, যোদ্ধা। এই সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ হোল সালাহ্।

বর্ত্তমানে পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ-জাতিগুলিতে যে বেসামরিক ও সামরিক *(Civil & Military)* বিভক্তি আছে তাতে বেসামরিক ভাগের প্রধান থাকেন প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী এবং সামরিক ভাগের প্রধান থাকেন- প্রধান সেনাপতি *(Commander in Chief)*। বেসামরিক লোকজন যখন প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর সামনে যায় তখন তারা সম্মুখে ঝুঁকে, জুবুথুবু, নুব্জ হোয়ে সম্মান প্রদর্শন করে; আর অন্য ভাগের সৈনিকেরা যখন প্রধান সেনাপতির সামনে যায় তখন সে লোহার রডের মত পিঠ, ঘাড় সোজা কোরে দৃপ্তপদে খট্ খট্ কোরে সেনাপতির সামনে যায় এবং যেয়ে তড়াক কোরে স্যালুট করে এবং সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে আদেশের অপেক্ষা করে এবং আদেশ হোলে প্রাণদিয়ে তা পালন করে। এই উম্মতে মোহাম্মদীতে যেহেতু ঐ বিভক্তি নেই, সম্পূর্ণ জাতিটাই সামরিক, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী নেই, আছে শুধু এমাম *(Commander in Chief)* এবং আমীরগণ, (আমীর শব্দের আক্ষরিক অর্থই হোল আদেশদাতা, *(Commander)* সেহেতু তার সালাহ্ হবে সৈনিক, যোদ্ধার মত।

বেসামরিক লোকজন প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী সামনে যেয়ে জুবু থুবু, নুব্জ নত হোয়ে সালাম দেয় কিন্তু ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থের প্রয়োজনে প্রেসিডেন্টের বা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের গদী থেকে অপসারণের চেষ্টা করে; কিন্তু যে সৈনিকরা দৃপ্তপদে সেনাপতির সামনে যেয়ে সোজা হোয়ে মাথা উঁচু কোরে সালাম দেয়, তারা কখনও সেনাপতির কোন আদেশের বিরুদ্ধে তো যায়ই না, তার আদেশের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এসলামে প্রকৃত সালাহ্ কেমন তা সহীহ হাদীসগুলি থেকে সংগ্রহ কোরলেই পরিষ্কার হোয়ে যায় যে বর্ত্তমানে অন্যান্য ধর্মের অনুকরণে গোঁজামিল দেবার চেষ্টায় সালাতের যে চেহারা হোয়েছে তা প্রকৃত সালাহ্ থেকে কতদূর। এই হাদীসগুলি একত্র কোরলে দেখা যায় যে, সঠিক এবং সম্পূর্ণভাবে সালাহ্ আদায় কোরলে একশ'রও বেশী নিয়ম-কানুন লক্ষ্য রেখে, সেগুলি যথাযথভাবে পালন কোরতে হয়। **এসলামের প্রকৃত সালাতে যতগুলি নিয়ম-কানুন কঠিন ভাবে পালন করতে হয় পৃথিবীর কোনও সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজেও ততগুলি নিয়ম-কানুন পালন কোরতে হয় না।** আল্লাহর রসুল বোলেছেন- তোমরা সালাহ্ পূর্ণভাবে কায়েম কর, কারণ আল্লাহ পূর্ণ ব্যাতিত সালাহ্ কবুল করেন না [হাদীস- আবু হোরায়রা (রা:) থেকে]। এই নিয়ম-কানুনের, পদ্ধতির অনেকগুলি বর্ত্তমানে যে নামায পড়া হয় তার মধ্যেই চালু আছে, যেমন শরীর পাক থাকা, নামাযের জায়গা পাক থাকা, কাবার দিক মুখ কোরে দাঁড়ানো ইত্যাদি সাধারণ নিয়ম-কানুন যে গুলো না হোলে নামাযের আর কিছুই থাকে না। কিন্তু সালাতের মধ্যে যে সব নিয়ম-

কানুন, পদ্ধতি সালাহ্‌কে সামরিক রূপ দেয় সেগুলিকে বাদ দেয়া হোয়েছে, সালাতের প্রাণকেই ছিনিয়ে নেয়া হোয়েছে। কাজেই এখানে শুধু সেই নিয়ম-কানুনগুলি উল্লেখ কোরবো।

সালাতের সঠিক অবস্থাগুলি ভাল কোরে বোঝাবার জন্য ছবি সংযোজন করা হোল।

তাকবীর: সোজা হোয়ে দাঁড়ানোর পর দুই হাত উঠিয়ে দুই বুড়া আঙ্গুল দুই কানের লতিতে স্পর্শ করাতে হবে এবং দুই হাতের তালু কোণাকোণীভাবে কেবলার দিকে রাখতে হবে।

হাত বাঁধা: অতঃপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জী দৃঢ়ভাবে ধোরতে হবে, বাম হাতও দৃঢ়ভাবে মুষ্ঠিবদ্ধ থাকবে। দুই হাত আবদ্ধভাবে নাভির নিচে স্থাপন করতে হবে।

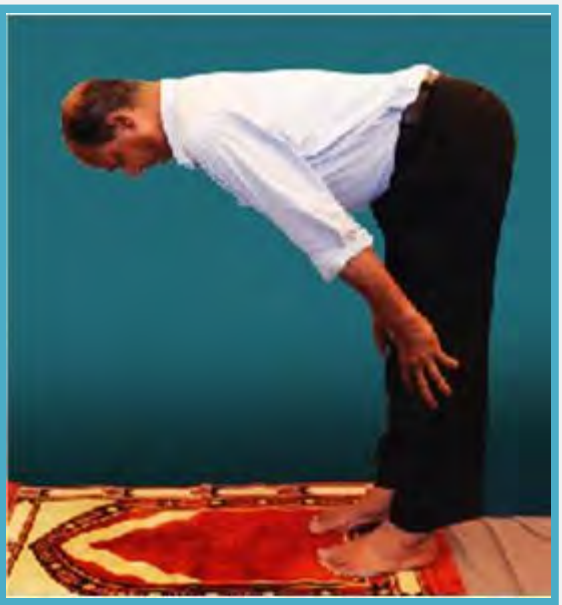

রুকু: মহানবী বোলেছেন, রুকুতে পিঠকে পিছন ও ঘাড়ের বরাবর সোজা রাখতে হবে। এ সময় মাথা নীচুও করা যাবে না, উঁচুও করা যাবে। - আয়েশা (রাঃ) থেকে মোসলেম।

রুকুতে দুই হাঁটু দৃঢ়ভাবে ধোরতে হবে এবং দুই বাহুকে সম্পূর্ণ সোজা রাখতে হবে।

সাজদা: সাজদায় দুই বাহুকে দেহের দুই পার্শ্ব হতে পৃথক রাখতে হবে এবং দুই পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কাবার দিকে মুড়িয়ে দিতে হবে (আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ্)। এসময় দুই পায়ের পাতা সম্পুর্ণ খাড়া ও সমান-রালভাবে থাকবে এদের মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব অপরিবর্ত্তিত অর্থাৎ চার আঙ্গুলই থাকবে। সাজদা অবস্থায় হাঁটু এবং কনুইয়ের মাঝে এতটুকু ফাঁক রাখতে হবে যাতে একটি ছাগলছানা সহজেই এপাশ থেকে ওপাশে চোলে যেতে পারে।

সাজদাতে নাক ও কপাল সমভাবে মুসাল্লায় স্থাপন কোরতে হবে। মেরুদণ্ড একদম সোজা হবে, দুইহাত মাথার দুইপার্শ্বে কান সামান্য দূরে রাখতে হবে। হাতদুটি পরস্পর সমান্তরালভাবে কাবামুখী থাকবে। দুই তালুর মাথার নিকটবর্তী ভাগে এতটুকু পরিমান উচু রাখতে হবে যাতে সেখানে একটি কোরে সুপারী রাখা যায়।

সাজদার সময় দু'পায়ের পাতা সমান্তরালভাবে খাড়া কোরে রাখতে হবে এবং পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী কোরে রাখতে হবে। দাঁড়াবার সময় যেমন দু' পা যার যার হাতের চার আঙ্গুল ফাঁক রাখতে হবে, সাজদার সময়ও দু'পায়ের মধ্যে সেই চার আঙ্গুল ফাঁকই রাখতে হবে।

বসা: সাজদা হতে উঠে এমনভাবে সোজা হোয়ে বোসতে হবে যাতে মাথা, ঘাড়, মেরুদণ্ড একই সরলরেখায় থাকে। দুই বাহু সম্পুর্ণ সোজা ও দৃঢ় থাকবে। দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটুকে রুকুর ন্যায় দৃঢ়ভাবে ধোরতে হবে।

রুকু ও সাজদায় দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটুকে এমনভাবে ধোরতে হবে যেভাবে বাজপাখি তার শিকার ধরে। দুই জানু পরস্পর সমান্তরাল থাকবে।

বসা অবস্থায় ডান পায়ের পাতা সম্পূর্ণ খাড়া থাকবে এবং আঙ্গুলগুলো মুড়িয়ে কেবলামুখি কোরে রাখতে হবে। এ সময় বাম পা শোয়ানো অবস্থায় থাকবে। দেহের সম্পূর্ণ ভর থাকবে বাম পায়ের ওপর।

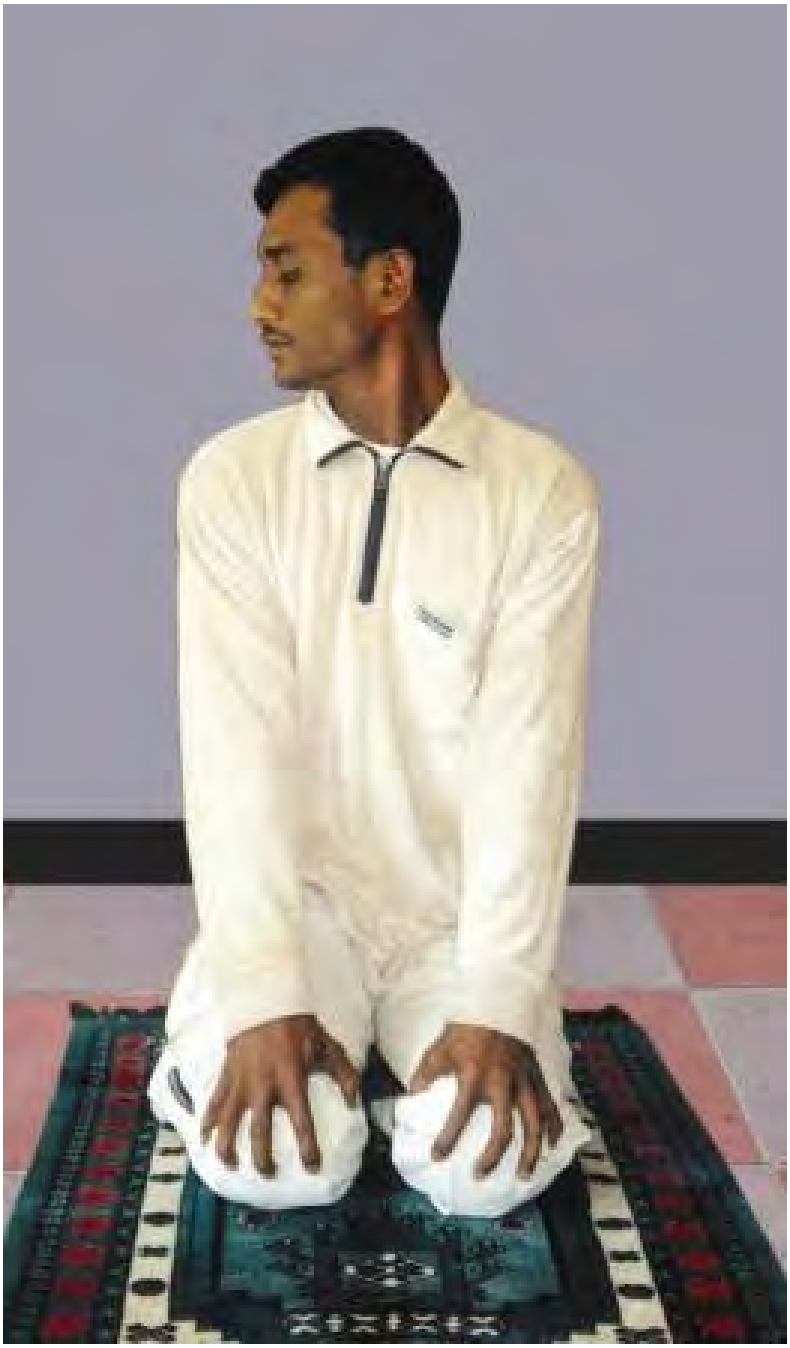

সালাম ফেরানো : সালাম ফেরানোর সময় ঘাড় একদম সোজা থাকবে, শুধু মুখমণ্ডল কাঁধ বরাবর সম্পুর্ণ ভাবে ঘুরে যাবে। এ সময় শরীর বিন্দুমাত্র নড়বে না বা ঘুরবে না।

সালাহ্ এসলামের কঙ্কাল

আল্লাহর রসূল বিভিন্ন সময়ে তাঁর আসহাবদেরকে এসলামের প্রকৃত আকীদা বোঝাতে বিভিন্ন ধরণের উপমা বা উদাহরণ ব্যবহার কোরেছেন। যেমন একটি ঘরের সাথে এসলামের তুলনা কোরে তিনি জেহাদ ও সালাতের সম্পর্ক আসহাবদের সামনে তুলে ধোরেছেন। তিনি বোলেছেন- এসলাম একটি ঘর, সালাহ তার খুঁটি এবং জেহাদ হোল ছাদ [হাদীস- মুয়ায (রা:) থেকে আহমদ, তিরমিযি, এবনে মাজাহ, মেশকাত]। এই উপমাতে রসুলাল্লাহ সালাহ ও জেহাদের সম্পর্ক, এদের উভয়ের প্রয়োজনীয়তা, এমনকি কোনটির প্রাধান্য বেশী *(Priority)* তা নিখুঁতভাবে তুলে ধোরেছেন। ছাদবিহীন একটি ঘরের কোনই মূল্য নেই, এমন কি সেই ঘর যদি দামী আসবাবপত্র ও গৃহস্থালী সামগ্রী দিয়ে সুসজ্জিত থাকে তবুও তা মূল্যহীন। এর খুঁটিগুলো যদি হীরা দিয়ে তৈরী থাকে তবুও ঘরের উদ্দেশ্য পূরণ হয় না; এ ঘরে কেউ বাস কোরতে পারবে না। বর্ত্তমানে মোসলেম নামক এই জাতিটি এসলামের ভিত্তি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের (তওহীদ) বদলে দাজ্জালের সার্বভৌমত্বকে সার্বিক জীবনে স্বীকার কোরে নিয়েছে আর ছাদ অর্থাৎ জেহাদ (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম) তাদের কাছে কেবল অপ্রয়োজনীয়ই নয়-অসহ্য। এখন তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবাদত হোচ্ছে সালাহ বা নামাজ। জান্নাতের প্রকৃত চাবি আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে (হাদীস- মু'আজ এবনে জাবাল থেকে আহমদ) ত্যাগ কোরে এই জাতি নামাজকে জান্নাতের চাবী বানিয়ে নিয়ে সারা দুনিয়ায় লক্ষ লক্ষ সুদৃশ্য মসজিদে কেবল শূণ্যের উপরই খুঁটি গেঁড়ে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এ খুঁটিগুলির উদ্দেশ্য কি তাও তারা জানেন না। ছাদ নির্মাণ না কোরে কেবল খুঁটি গাঁড়া যে কতটা নির্বুদ্ধিতার কাজ তা বোঝার জ্ঞানটুকুও আল্লাহর লা'নতের ফলে এ জাতির মধ্যে অবশিষ্ট নেই। ফলে এই সালাহ মোসলেম জাতির কোন কাজেই আসছে না; এ সালাহ তাদেরকে সকল জাতির লাথি ও ঘৃণা থেকে রক্ষা কোরতে পারছে না। ভিত্তি ও ছাদহীন খুঁটি সর্বস্ব এ ঘর (যদিও এমন ঘর অসম্ভব) তাদেরকে কোনই নিরাপত্তা দিতে পারছে না। এসলামের আকীদা বোঝাবার চেষ্টায় আমি আরও একটি উপমা পেশ কোরছি।

ধরা যাক পুরো মানবদেহটি হোচ্ছে এসলাম। এর মস্তিষ্ক *(Brain)* হোচ্ছে আকীদা, হৃৎপিণ্ড *(Heart)* হোচ্ছে তওহীদ, রক্ত সঞ্চালন *(Blood Circulation)* হেচ্ছে জেহাদ এবং কঙ্কাল *(Skeleton)* হচ্ছে সালাহ্। এই চারটি মানবদেহের অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ (*Vital Organ)*। যদি কোন মানুষের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে তাহোলে সে পাগল হোয়ে যায়। সে শারীরিকভাবে যতই সুস্থ সবল থাকুক, মানুষ হিসেবে তার কোন দাম থাকে না। এই মহাগুরুত্বপূর্ণ মস্তিষ্ক হোচ্ছে আকীদা। এ জন্যই অতীত ও বর্ত্তমানের সব আলেমরা একটি ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে আকীদা সঠিক না হোলে ঈমানের কোন দাম নেই। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির আকীদা যদি সঠিক না হয় তাহোলে তার ঈমান অর্থহীন এবং স্বভাবতই সেই ঈমানের উপর ভিত্তি কোরে করা সমস্ত আমলও

মূল্যহীন। ধরুন, কয়েকজন পাগলকে এক স্থানে রাখা হোল। তারা সেখানে কি কোরবে? কেউ গলা খুলে গান কোরবে, কেউ গভীর দুঃখে চিৎকার কোরে কাঁদবে, আবার কেউ উলঙ্গ নৃত্ত কোরবে ইত্যাদি। কারো মনে এ প্রশ্নই জাগবে না যে, কেন তাদেরকে এখানে আনা হোয়েছে। তাদেরকে দিয়ে কোন কাজই করানো সম্ভব হবে না। গত এক হাজার বছরের বেশী সময় ধোরে মোসলেম জাতিটির অবস্থাও ঠিক তেমন। কেউ নামাজকেই মুক্তির পথ মনে কোরে দিন রাত বহু ধরণের নামাজে রত, আবার কেউ ব্যস্ত যেকের কোরে ফানা ফিল্লাহ্ হওয়ার সাধনায়, কেউ এসলামকে বিক্রী কোরে খাচ্ছে, কেউ বা একে বানিয়ে নিয়েছে রাজনৈতিক হাতিয়ার। এ পরিস্থিতির একমাত্র কারণ এসলাম সম্পর্কে সঠিক আকীদা না থাকা। এজন্য মানব দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেমন মস্তিষ্ক, তেমনি এসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোচ্ছে আকীদা অর্থাৎ এসলামের উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক ও সম্যক ধারণা (*Correct Comprehensive Concept)।*

এসলামের হৃৎপিণ্ড, প্রাণ হোচ্ছে তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন এলাহ (সার্বভৌমত্বের মালিক ও হুকুমদাতা) নাই। তওহীদ বিহীন এসলাম এসলামই নয়। তওহীদ হলো এই দীনের ভিত্তি। একজন মানুষের মস্তিষ্কসহ শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থ সবল কিন্তু যদি তার মধ্যে প্রাণ না থাকে তাহোলে নিখুঁত দেহ নিয়েও সে একটি মরদেহ ছাড়া কিছু নয়, প্রাণহীন দেহ কিছুক্ষণের মধ্যেই পঁচতে গলতে আরম্ভ করে তাই তাড়াতাড়ি তাকে কবর দেয়া হয় বা পুড়িয়ে ফেলা হয়। তেমনি আল্লাহর সার্বভৌমত্বহীন এসলামও মৃত। হৃৎপিণ্ডের কাজ কি? হৃৎপিণ্ডের কাজ হোল পাম্প কোরে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা, সমস্ত দেহকে বাঁচিয়ে রাখা। জেহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) হোচ্ছে সেই রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া। এসলামে তওহীদের দাবি পূরণ করার জন্যই যেমন জেহাদ কোরতে হয় তেমনি মানব দেহের ক্ষেত্রেও হৃৎপিণ্ডের একমাত্র কাজই হোচ্ছে রক্তকে সারা দেহে প্রবাহিত করা। এই তিনটি মানবদেহের অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বা প্রক্রিয়া *(System)*। এ ছাড়াও মানবদেহে কিডনি, ফুসফুস, পাকস্থলী ইত্যাদিসহ আরও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আছে, তবে সেগুলো প্রথম তিনটির তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসব অঙ্গ যদি আক্রান্ত হয় তাহোলে চিকিৎসার মাধ্যমে তা সুস্থ কোরে তোলা যায়, এজন্য মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মরে যায় না। কিন্তু হৃদপিণ্ডের স্পন্দন (তওহীদ) যদি বন্ধ হোয়ে যায় এবং রক্ত সঞ্চালন (জেহাদ) না হয় তবে তার পরিণতি হবে তাৎক্ষণিক মৃত্যু। এজন্যই আল্লাহ কোর'আনে বোলেছেন- 'যদি তোমরা জেহাদ ত্যাগ করো তাহোলে আমি তোমাদের কঠিন শাস্তি দেব এবং তোমাদের ওপরে অন্য জাতি চাপিয়ে দেব (অর্থাৎ তোমাদেরকে অন্য জাতির গোলাম, দাস বানিয়ে দেব (সুরা তওবা-৩৯)।' রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হোয়ে গেলে যেমন মানুষ মৃত এবং অপ্রয়োজনীয় হোয়ে যায় তেমনি জেহাদ ত্যাগ কোরলে উম্মতে মোহাম্মদী মরে যাবে এবং তাদের অস্তিত্বের আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। আজ যেমন অর্দ্ধেক দুনিয়া জুড়ে ১৫০

কোটিরও বেশী উম্মতে মোহাম্মদীর দাবিদার এ জাতি বিরাট এক গলিত লাশের ন্যায় পড়ে আছে, কোন কাজেই আসছে না- শুধু গন্ধ ছড়াচ্ছে।

একই ভাবে কঙ্কালও মানবদেহের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ধরুন, সুস্থ মস্তিষ্কের একজন মানুষ, তার দেহের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গও সুস্থ সবল অথচ তার দেহে কোন কঙ্কাল বা কাঠামো নেই, তাহোলে তার অবস্থা কি হবে? কেবলই সে একটি গোশতের পিণ্ড। কারণ সে দাঁড়াতে পারবে না, বোসতে পারবে না, চলাফেরা কোরতে পারবে না, কথা বোলতে পারবে না, কোন একটি কাজও কোরতে পারবে না। এ অবস্থায় এই গোশতের স্তুপটির মধ্যে রক্ত সঞ্চালনও সম্ভব হবে না, কারণ শিরা উপশিরা গুলো একটা আরেকটার সাথে জড়িয়ে পেঁচিয়ে থাকবে। আর রক্ত সঞ্চালন না হোলে এ ক্ষেত্রেও পরিণতি একই হবে অর্থাৎ মৃত্যু ও পঁচন। মানবদেহের কঙ্কালকে এসলামে সালাহর সাথে তুলনা কোরলেও একই চিত্র ফুটে ওঠে। আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য যে চরিত্র দরকার সেই চরিত্র সালাহ ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। কঙ্কাল না থাকলে যেমন পরিণতিতে রক্তসঞ্চালন বন্ধ হোয়ে দেহের মৃত্যু ঘটে তেমনি সালাহ সঠিক পদ্ধতি ও আকীদায় কায়েম না করা হোলে ইস্পাতের ন্যায় ঐক্য, পিঁপড়ার মত শৃংখলা, মালায়েকের মত আনুগত্য, আসহাবে রসুলদের মত হেজরত এবং সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় চরিত্র সৃষ্টি হবে না, ফলে জেহাদ (সংগ্রাম) বন্ধ হোয়ে জাতির মৃত্যু হবে এবং অন্য জাতির গোলামে পরিণত হবে। এ কারণেই সালাহকে আল্লাহ ফরদ কোরে দিয়েছেন।

মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, রক্তপ্রবাহ, কঙ্কাল ইত্যাদি ছাড়াও মানবদেহে আরও যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি আছে সেগুলির মধ্যেও গুরুত্বের তফাৎ আছে। কোনটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কোনটা তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ, কোনটা আরও কম, তারপরে আরো কম। যেমন: এগুলোর পরেই আসে ফুসফুস, কিডনী, যকৃত ইত্যাদি। তারপর চোখ, কান, হাত পা। সবশেষে সৌন্দর্য্যের জন্য চুল, দাড়ি, গোফ, ভ্রু, চোখের পাপড়ি, নখ ইত্যাদি। চুল ও দাড়ি কেটে ফেললে শরীরের কোন ক্ষতিই হয় না। কারো নাক কেটে ফেললে তাকে দেখতে বিশ্রী দেখাবে কিন্তু সে মারা যাবে না। এমনকি যদি হাত পাও কেটে ফেলা হয় তবুও তার মৃত্যু হবে না। কিন্তু যদি মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটে তাহোলে সে পাগল হোয়ে যাবে ও পৃথিবীতে তার কোন মূল্য থাকবে না। যদি হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বা রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হোয়ে যায় তাহোলে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হবে। রক্ত সঞ্চালনই আমাদের দেহকে জীবিত রাখে। এই রক্ত সঞ্চালনের কারণেই আমাদের দেহের অঙ্গ থেকে শুরু কোরে একক কোষ পর্যন্ত সবকিছু বেঁচে থাকে, এমনকি আমাদের চুল নখের কোষগুলিরও জীবন ও বৃদ্ধি রক্ত সঞ্চালনের কারণেই সম্ভব হয়।

আজ থেকে ১৩'শ বছর আগে এসলামের প্রকৃত খেলাফত শেষ হোয়ে যাবার পর এই রক্ত সঞ্চালন অর্থাৎ জেহাদ বন্ধ হোয়ে গেল। ফলে আল্লাহ তাঁর রসুলের মাধ্যমে যে গতিশীল দীন (জীবন-ব্যবস্থা) পাঠিয়েছিলেন তাও প্রাণ হারিয়ে স্থবির হোয়ে গেল। এই বিকৃতমস্তিষ্ক ও মরা জাতিকে আল্লাহ্‌র প্রয়োজন নেই, তাই আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক (সূরা তওবা -৩৯) এ

জাতির ওপর থেকে তাঁর দয়ায় হাত সরিয়ে তাদেরকে কঠোর শাস্তির (আযাবুন আলীমা) মধ্যে নিক্ষেপ কোরলেন।

লক্ষণীয় বিষয় হোচ্ছে এই যে, আল্লাহ উম্মতে মোহাম্মদীকে তাঁর নির্বাচিত, নেয়ামতপ্রাপ্ত জাতি থেকে একটি অভিশপ্ত (মালাউন) জাতিতে পরিণত কোরলেন, তা কিন্তু এই জাতি বুঝতে পারল না। মো'মেনের সংজ্ঞা থেকে বের হোয়ে যাওয়ার পরও তারা ভাবতেই থাকলো তারা এখনও রসুলের হাতে গড়া মো'মেনদের মতই মো'মেন আছে। এ সময়ও তারা জেহাদহীন, রক্ত সঞ্চালনহীন মৃত এসলামের আনুষ্ঠানিকতা যথাসাধ্য পালন কোরে যেতে লাগল, কারণ তাদের মস্তিষ্ক অর্থাৎ আকীদা বিকৃত হোয়ে গেছে। কিন্তু এ মহাসত্য বোঝার অক্ষমতা জাতিকে স্বাভাবিক পচন প্রক্রিয়া এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুত কঠোর শাস্তি থেকে রক্ষা কোরতে পারল না। দুনিয়াময় তাদের পরাজয় ঘোটল এবং আল্লাহ তাদেরকে ইহুদী-খ্রীস্টানদের গোলাম বানিয়ে দিলেন। নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, যাদেরকে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দিয়ে এই জাতিকে তাদের একদা পরাজিত শত্রুর গোলাম কোরে দেওয়ার পরও তারা নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাহসহ এসলামের বহু রকম ফরদ, সুন্নাহ ও নফল এবাদতের আনুষ্ঠানিকতা কোরেই যেতে লাগল এবং এখনও কোরেই যাচ্ছে, এবং এগুলি কোরে নিজেদেরকে মহা মো'মেন ও উম্মতে মোহাম্মদী মনে কোরছে। আল্লাহ সেই সমস্ত আমলের দিকে একবারও চেয়ে দেখছেন না। এখনও তারা বিশ্বাস করে যে জান্নাত দরজা খুলে তাদের জন্য অপেক্ষা কোরছে। জেহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম) ভুলে যাবার কারণে জেহাদের মূল অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তাদের রোয়েছে বিকৃত ধারণাপ্রসূত সীমাহীন অজ্ঞতা। তাই অন্যন্য ধর্মের অনুসারীদের মতই তাদের সমস্ত আমল আজ নিষ্ফল, নিরর্থক।

মরক্কো থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত এসলামের এই বিশাল বিস্তৃত দেহটি আজ মরা ও দুর্গন্ধময়। অথচ এর অনুসারীরা এই মরা দেহটিকেই আকর্ষণীয় লেবাস পরাচ্ছে, খোশবু ও প্রসাধনী ব্যবহার কোরে সাজাচ্ছে, এর চুল দাড়ি আঁচড়িয়ে দিচ্ছে, চোখে সুরমা লাগিয়ে যে যার মত সাজিয়ে তুলছে। তাদের দৃষ্টি, শ্রবণ ও ঘ্রাণ নেওয়ার ক্ষমতা লুপ্ত হোয়ে যাবার কারণে তারা বুঝতে পারছে না যে, এসলামের এ দেহটি তো বহুদিনের মরা, পঁচা, গোলে যাওয়া একটি শবদেহ। এর মস্তিষ্ক (আকীদা) কাজ কোরছে না। এর আত্মা এখন আর প্রকৃত তওহীদ "লা-এলাহা এল্লা আল্লাহ- আল্লাহ ছাড়া কোন সার্বভৌম হুকুমদাতা নেই" নয়, সেটি বহু আগেই পরিবর্ত্তিত হোয়ে "লা-মা'বুদ এল্লা আল্লাহ - আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই" হোয়ে গেছে। কলেমার এই ভুল অর্থ এসলামের রক্ত সঞ্চালন বন্ধ কোরে দিয়েছে যার স্বাভাবিক ফল হোয়েছে এসলামের দেহটির মৃত্যু, ক্ষয় ও পচন। শুধু তাই নয়, বিকৃত আকীদায় সালাহ কায়েমের কারণে এর কঙ্কালও এখন মোমের মত নরম হোয়ে গিয়েছে, ফলে এর কোন আকার নাই, গঠন নাই, গলিত গোশতপিণ্ডের স্তুপ হোয়ে বিশ্বময় অথর্ব হোয়ে পড়ে আছে।

এই মরা এসলামের বিশাল দেহটিতে আবার প্রাণ সঞ্চার হবে যখন এতে এসলামের রূহ- প্রকৃত তওহীদ প্রবেশ কোরবে, ১৩০০ বছর আগে মোনাফেক আমীর-ওমরাহদের বন্ধ করা রক্ত

সঞ্চালন, জেহাদ আবার শুরু হবে। মৃত এ দেহটি তার হারানো গৌরব ফিরে পেয়ে আবার উঠে দাঁড়াবে। এ মরা জাতির জীবিত হওয়ার এটাই হোচ্ছে একমাত্র উপায়। অন্য আর কোন পথ নেই। যদি এ জাতি আল্লাহর তওহীদ মেনে না নেয়, তাহোলে আল্লাহর শাস্তি ও লা'নত হবে আরও কঠোর, আরও ভয়ঙ্কর। দেড়শো কোটির এ জনসংখ্যার প্রত্যেকেও যদি মহা পরহেযগার, তাহাজ্জুদী হোয়ে যায়, সারাবছর রোযা রাখে, প্রতি বছর হজ্জ করে এবং সবরকম গোনাহ থেকে বিরত থেকে রিপুজয়ী মহা-সুফী হোয়ে যায় তবুও তারা ইহ জগতে এবং পরকালে আল্লাহর কঠোরতম শাস্তির হাত থেকে পালাতে পারবে না।

কোন একজন মো'মেন বা গোটা জাতির আকীদা, তওহীদ, জেহাদ যতই উত্তম হোক, সালাহ যদি ঠিক না থাকে তাহোলে ঐ ব্যক্তি বা জাতি কোনদিন উম্মতে মোহাম্মদী হোতে পারবে না। যে চারিত্রিক কাঠামোর উপর উম্মতে মোহাম্মদী দাড়িয়ে থাকে সেই কাঠামোই হোচ্ছে পাঁচ দফার চরিত্র। সালাহ সঠিক আকীদা নিয়ে নিখুঁত ও পরিপূর্ণ ভাবে কায়েম না করা গেলে ঐ পাঁচ দফার চরিত্র জাতির মধ্যে কায়েম হবে না। ফলে জাতি হবে ঐক্যহীন, আনুগত্যহীন একটি বিশৃংখল জনগোষ্ঠী। কঙ্কাল না থাকায় কার্য্যক্ষমতা হারিয়ে, রক্তসংবহনতন্ত্র, শিরা, ধমনী রুদ্ধ হোয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মরে যাবে। সুতরাং মো'মেন সালাহতে যত বেশী আকীদাসম্পন্ন নিখুঁত ও নিয়মিত, সেই পারবে নিজের ভিতর উম্মতে মোহাম্মদীর চারিত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা কোরতে, আর কেউ পারবে না।

সালাতুল খওফ
উম্মতে মোহাম্মদীর অপরিহার্য্য অনুশীলন

আল্লাহ তাঁর রসুলকে হেদায়াহ ও সত্যদীন দিয়ে প্রেরণ কোরেছেন এই জন্য যে, তিনি যেন একে অন্যান্য সকল জীবন ব্যবস্থার ওপরে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া হিসাবে আল্লাহ নির্দ্ধারণ কোরলেন জেহাদ ও কেতাল অর্থাৎ সংগ্রাম। সেজন্য আল্লাহ রসুলকে পাঁচ দফা ভিত্তিক একটি কর্মসূচিও দান কোরেছেন। এই দফাগুলি হোচ্ছে- ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য, হেজরত ও জেহাদ। রসুল সত্যদীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এমন একটি জাতি গঠন করেন যা ছিল একটি অপরাজেয় মৃত্যুভয়হীন দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা জাতি, যাদের জাতীয় চরিত্রে উপরোক্ত পাঁচটি দফা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। এই পাঁচ দফা রসুল তাঁর উম্মাহর চরিত্রে প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন সালাহ এর মাধ্যমে। অর্থাৎ আল্লাহ সালাহ কায়েমের হুকুম দিয়েছেন তাঁর দেওয়া দায়িত্ব পালন কোরতে এ জাতির যে পাঁচদফা ভিত্তিক চরিত্র অপরিহার্য্য সেই চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণস্বরূপ। রসুল বোলেছেন, এসলাম একটি ঘর, সালাহ তার খুঁটি, জেহাদ তার ছাদ [হাদীস- মু'য়ায (রা:) থেকে আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, মেশকাত]। আমরা কোর'আন হাদীসে বিভিন্ন প্রকারের সালাহ দেখতে পাই যেমন- ফরদ, ওয়াজেব, সুন্নাহ, নফল ইত্যাদি। এদের মধ্যেও আছে অনেক প্রকারভেদ। এই জাতি যখন তাদের জীবনের প্রধান দায়িত্ব দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ত্যাগ কোরল, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সালাহ কায়েমের আকীদা বা উদ্দেশ্যও পরিবর্ত্তিত হোয়ে গেল। প্রশিক্ষণ থেকে সালাহ পরিবর্ত্তিত হোয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি আনুষ্ঠানিক ধ্যান বা উপাসনায় পরিণত হোল। বর্ত্তমানে এই বিকৃত উদ্দেশ্য নিয়েই এসলামের প্রধান আমল হিসাবে দুনিয়াময় সালাহ পড়া হোচ্ছে।

উম্মতে মোহাম্মদীকে সুশৃঙ্খল, আনুগত্যশীল, নিয়মানুবর্ত্তী, সময় সচেতন এবং আত্মিকভাবে প্রস্তুত একটি জাতি হিসাবে গঠন করার জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরদ সালাহ কায়েমের হুকুম আল্লাহ দিয়েছেন। এ সালাহ কিভাবে কায়েম কোরতে হবে তা রসুল হাতে কলমে কোরে দেখিয়ে দিয়েছেন। মো'মেনরা যখন সফরে যাবেন তখন কসর সালাহ অর্থাৎ এই ফরদ সালাহগুলির কোন কোনটি সংক্ষিপ্ত করার হুকুম দেওয়া হোয়েছে। কিন্তু সফরকালীন অবস্থায় অথবা কোন অভিযানের উদ্দেশ্যে বের হোলে কোন স্থানে যদি শত্রুর হামলার আশঙ্কা থাকে তাহোলে এই কসর সালাহ একটি বিশেষ পদ্ধতিতে কায়েম কোরতে হয়। এটাই হোচ্ছে "সালাতুল খওফ" (সুরা নেসা ১০১-১০২)। সালাতুল খওফের শাব্দিক অর্থ আশঙ্কাকালীন সালাহ্। সালাতুল খওফ কায়েম করা আল্লাহর হুকুম, তাই এটি একটি ফরদ সালাহ। আল্লাহ কোর'আনে যতগুলো সালাতের কথা উল্লেখ কোরেছেন তার সবগুলোই শেখানোর ভার দিয়েছেন রসুলের ওপর, এমনকি ওয়াক্তিয়া ফরদ সালাহও আল্লাহ নিজে শেখান নাই, যে সালাতের হুকুম আল্লাহ ৮২ বার দিয়েছেন।

একমাত্র সালাতুল খওফই এর ব্যতিক্রম। এটি শেখানোর ভার আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন। এর নিয়ম কানুন তিনি বিস্তারিতভাবে পবিত্র কোর'আনে বোলে দিয়েছেন। ওয়াক্তিয়া সালাতের নিয়মকানুন তিনি পবিত্র কোর'আনে বোলে দেন নি, এমন কি কোন্ সালাহর কি সময়, কত রাকাত তাও কোর'আনে উল্লেখ নেই। এগুলো আমরা সবই জেনেছি রসুলের মাধ্যমে। মজার ব্যাপার হোচ্ছে, যেই সালাহ আল্লাহ নিজে শেখালেন, যে সালাহ ফরদ, সেই সালাহ এই জাতি একেবারেই ভুলে গেল, অথচ ওয়াজেব, সুন্নাহ, নফল সালাহর বিষয়েও তারা অতি সতর্ক।

প্রকৃত এসলামের আকীদা যখন বিকৃত হোয়ে গেল তখন এই সালাতুল খওফের আকীদাও বিকৃত হোয়ে গেল, বলা চলে একেবারে পরিত্যাক্তই হোয়ে গেল। বহু শতাব্দী পার হোয়ে গেছে এ উম্মাহ আর জেহাদে যায় না, শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কাও তাদের মনে জাগ্রত হয় না। তাই সালাতুল খওফেরও আর প্রয়োজন হয় না। অথচ রসুল বহুবার আসহাবগণকে নিয়ে সালাতুল খওফ আদায় কোরেছেন। যাতুররিকা অভিযানে, বত্নে নখল এর অভিযানে এই সালাহ কায়েম করার কথা জানা যায়। কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় রসুল কাবার পরিবর্ত্তে যেদিক থেকে শত্রুবাহিনীর হামলার আশঙ্কা সেদিক মুখ কোরে তাঁর বাহিনীকে কাতারবদ্ধ কোরে সাজিয়েছেন। তারপর কোর'আনে উল্লেখিত নিয়মমাফিক সালাহ কায়েম কোরেছেন।

আল্লাহ বোলছেন, "যখন তোমরা যমিনে সফরে বের হবে, তোমরা সালাহ 'কসর' কোরবে, এতে তোমাদের কোন দোষ হবে না। যখন তোমরা আশঙ্কা করো শত্রুরা তোমাদেরকে হামলা কোরবে, নিশ্চয়ই কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, এমন অবস্থায় যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন এবং তাদের সালাহ করাবেন, তখন যেন মো'মেনদের মধ্য থেকে একদল এসে আপনার সাথে দাঁড়ায় এবং অস্ত্র-শস্ত্র তাদের সাথেই রাখে। অতঃপর যখন তারা সাজদা শেষ কোরবে তখন যেন আপনাদের পিছনে (প্রহরায় বা স্ব-স্ব দায়িত্বে) চোলে যায় এবং দ্বিতীয় দল যারা সালাতে অংশগ্রহণ করে নাই তারা এসে দাঁড়ায় এবং আপনার সাথে সালাহ কায়েম করে, সতর্কতা অবলম্বন করে এবং অস্ত্র-শস্ত্র তাদের সঙ্গে রাখে। কেননা, কাফেররা চায় যদি আপনারা আপনাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদ সম্ভার হতে অমনোযোগী হন, তারা হঠাৎ আক্রমণ কোরবে। (সুরা নেসা ১০১-১০২)

এ আয়াত এবং রসুলাল্লাহর সুন্নাহ অনুসারে সালাতুল খওফের নিয়মগুলি হোল:

১) পুরো বাহিনীকে দু'টো দলে বিভক্ত কোরতে হবে।

২) এমাম প্রথম দলটি নিয়ে সালাহতে দাঁড়াবেন। দুই রাকাত বিশিষ্ট এ সালাতে একমাত্র এমামই দুই রাকাতে অংশ নিবেন, আর মুক্তাদিগণের প্রত্যেক দল এক রাকাত কোরে কায়েম কোরবেন।

৩) সালাহ অবস্থাতেও প্রত্যেকের অস্ত্র তার সাথেই থাকবে। প্রত্যেকে সালাহ কায়েমের মধ্যেও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে থাকবেন সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন।

৪) অপর অংশটি এ সময় অস্ত্র নিয়ে পাহারায় বা যার যার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন এবং প্রত্যেকে থাকবেন চুড়ান্ত সতর্ক *(Alart)*।

৫) প্রথম রাকাতের সেজদা থেকে উঠে দাঁড়িয়েই সালাহরত মোজাহেদগণ চোলে আসবেন পাহারায় অর্থাৎ যারা এতক্ষণ সালাহতে অংশ নেন নাই তাদের অবস্থানে। তারা এসে পাহারায় অবস্থান নেওয়ার পর অর্থাৎ দায়িত্ব পূর্ণভাবে গ্রহণের পর পাহারারত দলটি এমামের পিছে গিয়ে সালাহতে অংশ নিবেন।

৬) দ্বিতীয় দল এসেই কাতার সোজা কোরে হাত বেঁধে ফেলবে। কাতার একটুও বাঁকা হওয়া যাবে না। তারা পুরোপুরিভাবে না দাঁড়ানো পর্যন্ত এমাম অপেক্ষা কোরবেন, এরই মধ্যে তার কেরাত (সুরা পড়া) চোলবে। এমাম যখন বুঝতে পারবেন তার পেছনে দ্বিতীয় দলটি প্রস্তুত তখন তিনি রুকুতে যাবেন এবং বাকী এক রাকাত সালাহ শেষ কোরে সালাম ফেরাবেন।

৭) পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে চুড়ান্ত শৃংখলার মধ্য দিয়ে। অবস্থান পরিবর্ত্তনের সময় যেন কোনরূপ বিশৃংখলা না ঘটে সেদিকে থাকতে হবে অত্যন্ত সতর্ক। প্রথম দল সেজদাহ থেকে উঠে সালাতের দৃঢ়তা বজায় রেখে ঋজুভাবে দ্রুত দ্বিতীয় দলের সাথে অবস্থান পরিবর্ত্তন কোরে নিবে। এ সময় ঢিলেঢালা আচরণ করা যাবে না। আর খেয়াল রাখতে হবে পাহারার স্থান যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও শূন্য না হোয়ে যায়।

৮) সালাহ শেষ কোরে এমাম পুরো বাহিনীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ কোরবেন অর্থাৎ সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি না তা দেখবেন এবং আগের মতই সম্পূর্ণ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ কোরবেন।

এসলামের আকীদা বিকৃতির সাথে সাথে এর ছোট বড় প্রতিটি বিষয় বিকৃত হোয়ে গেছে। শুধু বিকৃতই হয় নি, একেবারে বিপরীতমুখী হোয়ে গেছে। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দেওয়া যায় এমন: একটি গাড়ি যখন পেছন দিকে যায়, তার চাকা, স্টিয়ারিং, বডি সব কিছু নিয়েই পেছন দিকে যায়, কোন একটি অংশ রেখে যায় না। ঠিক তা-ই হোয়েছে এসলামের বেলাতে। এসলামী শরিয়াহর অনেক গবেষক সালাতুল খওফের আয়াতগুলি নিয়ে এমন মত প্রকাশ কোরেছেন যে, প্রশ্ন এসে যায় বর্ত্তমান কালে সালাতুল খওফ পড়া জায়েজ কি না জায়েজ। কেউ চুলচেরা বিশ্লেষণ কোরতে কোরতে একে এমন জটিল আকার দিয়েছেন যে, এর মধ্য থেকে সালাতের সঠিক রূপটি খুঁজে পাওয়াই কঠিন। পক্ষান্তরে কোন কোন বিশেষজ্ঞ এর কোন গুরুত্বই দেন নি। যে সালাহ কায়েমের হুকুম আল্লাহ নিজে দিয়েছেন, অর্থাৎ যে সালাহ ফরদ, যে একমাত্র সালাহ আল্লাহ নিজে শিখিয়েছেন সেই সালাহ কিভাবে পরিত্যাক্ত হোয়েছে তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। গত জুন ২০০০ এ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত ৭৪৮ পৃষ্ঠার বৃহদায়তন বই "দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম" এর সালাহ সংক্রান্ত অধ্যায়ে সর্বমোট ২২ রকমের সালাহর বিবরণ উল্লেখ করা হোয়েছে, যেমন তাহিয়াতুল ওজু, তাহিয়াতুল মাসজীদ, এশারাক, চাশত, আওয়াবীন, তাহায্যুদ, সালাতুল তাসবীহ, এস্তেখারার সালাহ, তারাবীহ, কুসুফ ও খুসুফের সালাহ, এস্তেস্কার সালাহ।

কোন সালাহ কোন সময়ে, কত রাকাত, কি পদ্ধতিতে কায়েম কোরতে হবে তার সবই বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হোয়েছে। এগুলির মধ্যে মাত্র দুই প্রকার সালাহ ফরদ ওয়াক্তিয়া সালাহ ও জুম্মার সালাহ (কসরের সালাহ ওয়াক্তিয়া সালাহর অন্তর্ভুক্ত), বাকিগুলো ওয়াজেব, সুন্নাহ, নফল, মুস্তাহাব ইত্যাদি। এত প্রকারের সালাহর মধ্যে ফরদসহ একটিও আল্লাহ নিজে শেখান নি। কিন্তু সালাতুল খওফ তিনি ফরদ কোরে দিয়েছেন, এবং কেমন কোরে এ সালাহ কায়েম কোরতে হবে তার সম্পূর্ণটা তিনি নিজে শিখিয়েছেন, অথচ এই সালাহর কোন উল্লেখই এই বইতে করা হয় নি।

কোন কোন খ্যাতিমান আলেম সালাতুল খওফকে কেবল গুরুত্বহীনই করেন নি, এর উদ্দেশ্যও পাল্টে দিয়েছেন। যেমন হাকীমুল উম্মত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র:) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'বেহেশতী জেওর' এর ২য় খণ্ডে ছালাতুল 'খাওফের বয়ান' নামক অনুচ্ছেদে লিখেছেন, ''যখনই কোন ভয়াবহ ঘটনা ঘটে বা কোন বিপদ বা বালা মুসিবত দেখা দেয়, তখন নামাজ পড়া সুন্নাত। যেমন- ঝড়ের সময়, ভূমিকম্পের সময়, বজ্রপাতের সময়, যখন অনেক বেশী তারা ছোটে (উল্কাপাত), শিলাবৃষ্টি বা বরফ পড়ে, অতিরিক্ত বৃষ্টি হোতে থাকে, দেশে কলেরা-বসন্ত বা প্লেগ ইত্যাদি মহামারী আকারে প্রকাশ পায় বা শত্রু ঘিরে ফেলে, কিন্তু এ সব নামাযের জন্য জামায়াতে নয়, প্রত্যেকে নিজে নিজে পৃথক পৃথক ভাবে একাকী নামায পড়তে হবে।'' সালাতুল খওফে সম্পর্কে মৌলানা সাহেবের এই অভিমত সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই। তবে ঝড়, বৃষ্টি, উল্কাপাত, কলেরা, প্লেগ, মহামারি, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদির বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রহরা দেওয়া কী অর্থ বহন করে তা আমার বোধগম্য নয়। তবে সব আলেমই এমন নয়, কেউ কেউ সত্যিকার সালাতুল খওফ সম্পর্কেও ভালো ধারণা দিয়েছেন। কিন্তু তারাও এ বিষয়টি নিয়ে আকীদা বিকৃতির কারণে এতটাই বাড়াবাড়ি কোরে ফেলেছেন যে তা আর আমাদের মত সাধারণ মানুষের বোধগম্য নেই। উদাহরণ হিসাবে একটি প্রশ্ন পেশ কোরছি:-

সালাহরত অবস্থায় শত্রু আক্রমণ কোরলে কি করণীয়?

প্রশ্নটি খুবই অবান্তর মনে হোচ্ছে, তাই না? প্রকৃতপক্ষেই প্রশ্নটি অবান্তর এবং বুদ্ধিহীন। অথচ এই প্রশ্নই এসলামের ফকীহ, পণ্ডিতদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়। সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়, জেহাদের ময়দানে যদি শত্রু সালাতের সময় আক্রমণ কোরে বসে তখনও সালাহ চালিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, সালাতের চিন্তা করাও সম্ভব নয়। যে জেহাদের জন্য সালাহ, সেই জেহাদ চলাকালীন সময়ে জেহাদে অংশ না নিয়ে সালাহ কায়েম করা কেবল পাগলামি নয়, আত্মহত্যার নামান্তর। অথচ এসলামের পরবর্ত্তী যুগের জেহাদ-বিমুখ ফকীহরা সালাহকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে তাদের কেউ কেউ জেহাদ চলাকালীনও সালাহ কায়েম কোরেই যেতে হবে, এমন মত পোষণ কোরেছেন। বিখ্যাত 'হেদায়াহ' গ্রন্থে সালাতুল খওফের ফতোয়ায় বলা হোয়েছে, **'সালাহ অবস্থায় লড়াই কোরবে না, কোরলে সালাহ বাতিল হোয়ে যাবে।'** কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হোয়েছে, 'কেননা খন্দকের দিন নবী ব্যস্ততার কারণে চার ওয়াক্ত সালাহ

আদায় করেন নি।' খেয়াল কোরলে দেখবেন, যে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ উদাহরণ পেশ করা হোল তা বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। খন্দকের এ ঘটনা থেকেই সুস্পষ্ট হোয়ে যায় যে উল্লেখিত ফতোয়া ঠিক নয়। কিভাবে দেখা যাক। খন্দকের যুদ্ধের প্রাক্কালে নবী ও তাঁর সাহাবীরা শত্রুর মোকাবেলার একটি কৌশলস্বরূপ পরিখা খনন কোরছিলেন। এ সময় রসুল চার ওয়াক্ত সালাহ কায়েম করেন নি। এটা যুদ্ধ চলাকালীন কোন ঘটনা নয়। শত্রু তখনও আসেই নাই, কেবল প্রতিরক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি চোলছিল। প্রশ্ন হোল, প্রস্তুতির সময়েই যদি রসুল সালাহ পরিত্যাগ কোরে থাকেন, তাহোলে যুদ্ধাবস্থায় সালাহ কায়েমের প্রসঙ্গ কিভাবে আসতে পারে? অথচ বিজ্ঞ ফকীহ বোলেছেন, 'সালাহ অবস্থায় লড়াই কোরবে না।' এর অর্থ যুদ্ধের সময় ওয়াক্ত হোলে সালাহ কায়েম কোরবে, লড়াই কোরবে না। শত্রু সকলকে নিশ্চিহ্ন কোরে ফেললেও সালাহ বাদ দেওয়া যাবে না। রসুলের উপরোক্ত সুন্নাহ মোতাবেক ফতোয়াটি হওয়া উচিৎ ছিল এমন, "যুদ্ধ অবস্থায় সালাহ কায়েম কোরবে না, কোরলে সালাহ হবে না। শুধু তা-ই নয়, যুদ্ধ-প্রস্তুতির ব্যস্ততম সময়েও সালাহ বন্ধ রেখে প্রস্তুতি গ্রহণ কোরতে হবে।" আলেমদের এ জাতীয় সাধারণ জ্ঞান পরিপন্থী ফতোয়ার বাস্তব ফল হোয়েছে এই যে, পরবর্ত্তীতে বহুস্থানে শত্রুরা নামাজরত অবস্থায় মোসলেমদেরকে আক্রমণ কোরে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ কোরে দিয়েছে। প্রতিরোধ করা তো দূরের কথা, আত্মরক্ষাও করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এ নিয়ে বহু আল্লামা, মাশায়েখগণ গর্ব কোরে বোলেছেন, "আমরা সেই জাতি যারা যুদ্ধের সময়েও নামাজ পড়ি।"

আকীদা বিকৃতির ফল কী ভয়ঙ্কর!

জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস

এই ছোট্ট পুস্তিকাটি *(Booklet)* প্রকাশ হবার পর থেকে এ পর্যন্ত যে বিষয়টি লক্ষ্য করা গেলো তা হোচ্ছে এই যে মোসলেম বোলে পরিচিত এই জনসংখ্যার যে অংশটুকু এই দেশে আছে তাদের একাংশ হয় ভীত হোয়েছেন না হয় চিন্তিত হোয়ে পোড়েছেন। এই অংশটি হোচ্ছে জাতির সেই অংশ যেটা কিছুতেই আল্লাহ, রসুলের দীন প্রতিষ্ঠা হোক তা চায় না। তারা আমাদের জীবনে আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থা, দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে সন্ত্রাসী, জঙ্গীবাদ ইত্যাদি নাম দিয়ে মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন কোরতে চান। আমার এই বইয়ে যে জেহাদ, কেতাল ইত্যাদিকে সন্ত্রাস বোলে চিহ্নিত কোরতে চান। **জেহাদ আর সন্ত্রাস এক জিনিস নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।** জেহাদ শব্দের অর্থ কোন কাজ কোরতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা; আর সন্ত্রাস হোচ্ছে হিংসাত্মক কাজ কোরে, বোমা ফাটিয়ে, ধ্বংস কোরে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করা। কিন্তু মোসলেম নামধারী কিন্তু কার্যত কাফের ও মোশরেক এই লোকগুলি জেহাদকে সন্ত্রাস বোলে চালিয়ে, জেহাদের বিরুদ্ধে মানসিকতা গড়ে তুলতে চান। অথচ দীন প্রতিষ্ঠার এই জেহাদ অর্থাৎ প্রচেষ্টা ছাড়া দীনুল এসলামই অসম্পূর্ণ; কারণ **ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে, মো'মেন হবার সংজ্ঞা, শর্ত্তের মধ্যেই আল্লাহ এই জেহাদ অর্থাৎ দীন প্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টাকে, সংগ্রামকে ঢুকিয়ে দিয়ে রেখেছেন।** (দেখুন- সুরা হুজরাত, আয়াত ১৫)

যারা আমাদের জীবনে আল্লাহর দীনুল হক, এসলাম প্রতিষ্ঠা হোক তা চান না তারা **স্বভাবতই এই প্রচেষ্টাকে অর্থাৎ জেহাদকেও চান না,** এটাই স্বাভাবিক। তারা জেহাদ অর্থাৎ প্রচেষ্টাকে হেয়, মন্দ কাজ বোলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় একে সন্ত্রাসের সঙ্গে এক কোরে দিয়েছেন, যাতে সাধারণ মানুষ সন্ত্রাসকে ঘৃণার সাথে জেহাদকেও ঘৃণা করে। যেহেতু এসলাম বিরোধী এই লোকগুলির নিয়ন্ত্রণেই দেশের অধিকাংশ প্রচার ব্যবস্থা অর্থাৎ মিডিয়া *(Media),* সেহেতু তাদের অবিশ্রান্ত মিথ্যা প্রচারের ফলে তারা প্রায় সফলও হোয়েছেন। মোসলেম ও মো'মেন হবার দাবীদারও আজ নিজেকে কোনভাবে জেহাদ অর্থাৎ দীনুল হক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত হবার কথা স্বীকার কোরতে ভয় পান এবং করেনও না।

সুতরাং প্রয়োজন হোয়ে পোড়েছে যে দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় **জেহাদ এবং কেতালের স্থান কোথায় তা নির্দিষ্ট করা।** জেহাদ শব্দের অর্থ সংগ্রাম, সর্বাত্মক সংগ্রাম, প্রচেষ্টা। জেহাদ হোচ্ছে দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা মানুষকে মুখে বোলে, লিখে জানিয়ে, বক্তৃতা কোরে, যুক্তি উপস্থাপন কোরে, বুঝিয়ে ইত্যাদি ভাবে। আর কেতাল একেবারে ভিন্ন শব্দ যার অর্থ সশস্ত্র যুদ্ধ। **জেহাদ ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠি ইত্যাদির পর্যায়ে এবং কেতাল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে।** কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বা দল যদি দীন প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র হাতে নেয় তবে সেটা হবে মারাত্মক ভুল। তাদের কাজ হবে মানুষকে যুক্তি দিয়ে কোর'আন-হাদীস দেখিয়ে, বই লিখে, বক্তৃতা কোরে অর্থাৎ সর্বপ্রকারে মানুষকে এ কথা বোঝানো যে পৃথিবীতে অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন, শোষণ, ক্রন্দন, রক্তপাত,

যুদ্ধহীন একটি সমাজে নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের মধ্যে অর্থাৎ নিরংকুশ শান্তিতে বাস কোরতে হোলে একমাত্র পথ যিনি আমাদের সৃষ্টি কোরেছেন তাঁর দেয়া জীবন বিধান মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালনা করা। সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে, যে যে জিনিস তৈরী কোরেছেন তাঁর চেয়ে আর কে জানবে যে জিনিসটি কিভাবে চালালে সেটা ঠিকমত, ভালোভাবে চোলবে। আল্লাহ সুরা মুলকের ১৪ নং আয়াতে **বোলেছেন- যে সৃষ্টি কোরেছে তার চেয়ে বেশী জান?** (তুমি সৃষ্ট হোয়ে?) এ যুক্তির কোন জবাব আছে? কিন্তু আমরা মো'মেন মোসলেম হবার দাবীদার হোয়েও দাজ্জালের (ইহুদী খ্রীস্টান বস্তুবাদী সভ্যতা) নির্দেশে আল্লাহর দেয়া দীন, জীবন-ব্যবস্থা থেকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অংশটুকু ছাড়া সমষ্টিগত (যেটাই প্রধান) অংশটুকু বাদ দিয়ে সেখানে নিজেরা বিধান, আইন-কানুন, নিয়মনীতি নির্দ্ধারণ কোরে সেই মোতাবেক আমাদের সমষ্টিগত জীবন পরিচালিত কোরছি। ফল কি হোয়েছে? শিক্ষা দীক্ষায়, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে **মানব ইতিহাসের চুড়ান্ত স্থানে উপস্থিত হোয়েও আজ পৃথিবী অশান্তি, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার আর মানুষে মানুষে সংঘর্ষ ও রক্তপাতে অস্থির।** তাহোলে প্রমাণ হোয়ে যাচ্ছে যে মানুষ তার জীবন পরিচালনার জন্য যে ব্যবস্থা তৈরী কোরে নিয়েছে তা তাকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হোয়েছে। কাজেই মানুষকেই বোঝাতে হবে যে এ পথ ত্যাগ কোরে মানুষের সার্বভৌমত্বকে ত্যাগ কোরে আল্লাহর রসুল যা শিখিয়েছেন সেই আল্লাহর সার্বভৌমত্বে ফিরে যেতে হবে, সেই সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ কোরে তাঁর দেয়া দীন, জীবন-ব্যবস্থাকে গ্রহণ কোরে আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা কোরতে হবে। এই কাজ কি জোর কোরে করাবার কাজ? এটাতো সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে জোর কোরে, শক্তি প্রয়োগ কোরে মানুষকে কোন কিছু বিশ্বাস করানো অসম্ভব।

হেযবুত তওহীদ এই কাজটাই করার সংকল্প কোরছে এবং কোরছে মানুষকে বুঝিয়ে, যুক্তি দিয়ে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বে (উলুহিয়াতে) মানুষকে ফিরে আসার আহ্বান কোরছে। এই কাজ করার জন্য হেযবুত তওহীদ প্রক্রিয়া গ্রহণ কোরেছে আল্লাহর রসুলের প্রক্রিয়া, অর্থাৎ তরিকাহ। তিনি কি কোরেছিলেন? মক্কী জীবনের তের বছর তাঁর আহ্বান অর্থাৎ বালাগ ছিলো ব্যক্তি ও দলগত পর্যায়ে। তাই তিনি ও তাঁর দল সর্বপ্রকার অত্যাচার, মিথ্যা দোষারোপ, নির্যাতন সহ্য কোরেছেন- কোন প্রতিঘাত করেন নি। হেযবুত তওহীদের মোজাহেদরাও আজ ষোল বছর ধোরে মানুষকে তওহীদের, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বালাগ দিয়ে আসছে, এটা কোরতে যেয়ে তারা বিরুদ্ধবাদিদের গালাগালি খাচ্ছে, অপমানিত হোচ্ছে, মার খাচ্ছে প্রচণ্ডভাবে নির্যাতিত হোচ্ছে। দাজ্জালের অনুসারী, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার বিরোধী এদের দ্বারা হেযবুত তওহীদের মোজাহেদরা বহুস্থানে বহুবার আক্রান্ত হোয়েছেন, তাদের আক্রমণে বহু মোজাহেদ সাংঘাতিকভাবে জখম, আহত হোয়েছেন এবং একজন পুরুষ মোজাহেদ এবং একজন নারী মোজাহেদা প্রাণ দিয়েছেন, শহীদ হোয়েছেন। তাদের মিথ্যা প্রচারে ও প্ররোচনায় প্রভাবিত হোয়ে পুলিশ মোজাহেদদের গ্রেফতার কোরছে, তাদের শারিরিক নির্যাতন কোরছে, জেলে দিচ্ছে, তাদের নামে আদালতে মামলা দিচ্ছে, এমন কি একেবারে মিথ্যা মামলাও দিচ্ছে। কিন্তু এই ষোল বছরে ১৮১ টির মত

মামলার একটিতেও কোন মোজাহেদ আদালতের বিচারে দোষী প্রমাণিত হয় নাই, একটিতেও শাস্তি হয় নাই।

হেযবুত তওহীদের জন্মের সময় থেকেই আমি **নীতি হিসাবে রসুলের এই তরিকা অনুসরণ কোরেছি।** আমার কঠিন নির্দেশ দেয়া আছে কোন মোজাহেদ কোন রকম বে-আইনী কাজ কোরবে না, কোন আইন ভঙ্গ কোরবে না, কোন বে-আইনী অস্ত্র হাতে নেবে না। যদি আমি জানতে পারি যে কোন মোজাহেদদের কাছে কোন বে-আইনী অস্ত্র আছে তবে আমিই পুলিশে খবর দিয়ে তাকে ধরিয়ে দেব। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন মোজাহেদ কোন বে-আইনী কাজ কোরে কোন অস্ত্র মামলায় আদালত থেকে শাস্তি পায় নাই। কিন্তু তাতে পুলিশের হয়রানি করা থামে নাই। হেযবুত তওহীদ সম্বন্ধে মিডিয়ার (সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি) অবিশ্রান্ত মিথ্যা প্রচারে প্রভাবিত হোয়ে পুলিশ এখনও এখানে সেখানে মোজাহেদদের গ্রেফতার কোরছে, আর কোন অপরাধ না পেয়ে ৫৪ ধারায় অভিযুক্ত কোরে চালান দিচ্ছে কিন্তু স্বভাবতই আদালত থেকে কোন সাজা হোচ্ছে না।

আল্লাহর রসুলের তের বছরের মক্কী জীবনও ছিলো শুধু এক তরফা নির্যাতন। তারপর মদীনার মানুষ যখন তাঁর তওহীদের ডাক গ্রহণ কোরল, তখন তিনি হেজরত কোরে সেখানে যেয়ে রাষ্ট্র গঠন কোরলেন। যেই রাষ্ট্র গঠন কোরলেন তখনই নীতি বদলে গেলো। **কারণ কোন রাষ্ট্র কোনদিন ব্যক্তি বা দলের নীতিতে টিকে থাকতে পারে না।** তখন তাঁর প্রয়োজন হবে অস্ত্রের, সৈনিকের, যুদ্ধের প্রশিক্ষণের। আল্লাহর রসুলও তাই কোরলেন- হাতে অস্ত্র নিলেন এবং তখন থেকে তাঁর পবিত্র জীবনের বাকিটার সমস্তটাই কাটলো যুদ্ধ কোরে। অর্থাৎ তওহীদ ভিত্তিক এই সত্যদীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় **ব্যক্তি গোষ্ঠি বা দলগতভাবে কোনও কেতাল অর্থাৎ সশস্ত্র যুদ্ধ নেই,** আছে শুধু তওহীদের, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের আহ্বান, বালাগ দেয়া। ঠিক তেমনি **রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আছে সশস্ত্র যুদ্ধ।** রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অস্ত্র, যুদ্ধ ইত্যাদি যদি আইন সম্মত না হয় তবে পৃথিবীর সব দেশের সামরিক বাহিনীই বে-আইনী, সন্ত্রাসী। কোর'আন ও হাদীসে যে জেহাদ ও কেতালের কথা আছে তা রাষ্ট্রগত। হেযবুত তওহীদের মোজাহেদদের বাড়িতে যেয়ে তাদের গ্রেফতার করার কথা ফলাও কোরে কাগজে, রেডিও, টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। টেলিভিশনের পর্দায় তাদের হাতকড়া পড়ানো অবস্থায় দেখানো হয়; আর দেখানো হয় আমার লেখা পুস্তিকাগুলি, এই বইটি ও এসলামের প্রকৃত রূপরেখা, দাজ্জাল? ইহুদী খ্রীস্টান 'সভ্যতা'!, হ্যাণ্ডবিল ইত্যাদি। পুলিশ এবং মিডিয়ার লোকজনদের, টি.ভির পর্দায় বুক ফোলানো ছবি দেখে মনে হয় তারা গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছেন। অথচ ঐ বইগুলি আমার নির্দেশে অনেক আগেই বাংলাদেশের অধিকাংশ থানায় মোজাহেদরা নিজেরা যেয়ে পৌঁছে দিয়েছে। দ্বিতীয় কথা হোল বলা হয় ঐ জব্দ করা বইগুলি জেহাদী বই- ওতে জেহাদ ও কেতালের কথা লেখা আছে। জেহাদ এবং কেতালের কথা লেখা আছে বোলে যদি ঐ বইগুলি জব্দ অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত করা হয় তবে তাদের কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে গেলো; কারণ ঐ বাড়িতেই অন্তত আরও দুইটি বই আছে যাতে **আমার বইয়ে জেহাদ ও কেতাল যতবার লেখা আছে তা থেকে বহুগুণ বেশীবার ঐ শব্দ দুটি, জেহাদ ও কেতাল লেখা আছে।** শুধু

লেখা আছে নয় যা করার জন্য সরাসরি আদেশ দেওয়া আছে, এবং কোরলে মহাপুরস্কার এবং না কোরলে কঠিন শাস্তির কথা লেখা আছে। ঐ বই দুইটির একটি আল্লাহর কোর'আন এবং অন্যটি রসুলের হাদীস। ঐ বই দুইটি বাজেয়াপ্ত না কোরে শুধু আমার ছোট ছোট দু'একটি পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত কোরে তা উঁচু কোরে টি.ভির পর্দায় দেখানো অযৌক্তিক, যুক্তিসম্মত নয়।

আমরা কোর'আন-হাদীস দেখিয়ে, যুক্তি দিয়ে, প্রমাণ দিয়ে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা কোরছি যে তওহীদ ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থা ছাড়া **মানুষের জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তার আর কোন বিকল্প পথ নেই।** বর্ত্তমান অশান্ত পৃথিবীই তার প্রমাণ। এখানে জোর জবরদস্তির কোন স্থান নেই, মানুষকে জোর কোরে কোন কিছু বোঝানো যায় না এটা সাধারণ জ্ঞান *(Common sense),* মানুষ যদি একে গ্রহণ করে তবে দেশে তওহীদ ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, আর যদি মানুষ আমাদের ডাকে সাড়া না দেয়, মানুষের সার্বভৌমত্বকেই, মানুষের উলুহিয়াতকেই আঁকড়ে ধোরে থাকে তবে আমাদের কিছু করার নেই। আল্লাহর যা ইচ্ছা কোরবেন। আর যদি মানুষ আমাদের কথা বোঝে, সাড়া দেয়, দাজ্জালের শেখানো বর্ত্তমানের মানুষের সার্বভৌমত্বকে অর্থাৎ শের্ক ও কুফর ছেড়ে দিয়ে তওবা কোরে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদ ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে তবে তখন আসবে কেতালের অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের, যুদ্ধের সময়। সুতরাং এখন যে হেযবুত তওহীদকে জঙ্গী, জেহাদী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি বোলে প্রচার করা হয় তা জঘন্য মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আজ যে হেযবুত তওহীদকে ঐভাবে চিত্রিত করার আপ্রাণ চেষ্টা হোচ্ছে তার বিরাট এবং গভীর কারণ আছে। কিন্তু তা এখানে আলোচনা করার নয়। কিন্তু তাদের এ চেষ্টা এনশাল্লাহ ব্যর্থ হবে কারণ হেযবুত তওহীদ যে মহাসত্য প্রচার কোরছে তার চেয়ে বড় আর কোন সত্য আসমান ও যমিনে নেই, আর তা হোল আল্লাহর তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ লা এলাহা এল্লাল্লাহ, মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ (দ:)।

আল্লাহ সুরা তওবার ৩২ নং আয়াতে বোলেছেন- তারা (কাফের, মোশরেকরা) তাদের মুখের ফুঁৎকার দিয়ে আল্লাহর নুরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নুরের পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া অন্য কিছু চান না, তা কাফেরদের কাছে যত অপ্রীতিকরই হোক। **এনশাল্লাহ তারা হেযবুত তওহীদকেও ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে পারবে না।**